তালনবমী

Click Here For More Books>>

তালনবমী

ঝমঝম বর্ষা।

ভাদ্র মাসের দিন। আজ দিন পনেরো ধরে বর্ষা নেমেচে, তার আর বিরামও নেই, বিশ্রামও নেই। ক্ষুদিরাম ভট্‌চাজের বাড়ি আজ দু'দিন হাঁড়ি চড়ে নি।

ক্ষুদিরাম সামান্য আয়ের গৃহস্থ। জমিজমার সামান্য কিছু আয় এবং দু-চার ঘর শিষ্য-যজমানের বাড়ি ঘুরে-ঘুরে কায়ক্লেশে সংসার চলে। এই ভীষণ বর্ষায় গ্রামের কত গৃহস্থের বাড়িতেই পুত্র-কন্যা অনাহারে আছে,—ক্ষুদিরাম তো সামান্য গৃহস্থ মাত্র! যজমান-বাড়ি থেকে যে ক'টি ধান এসেছিল, তা ফুরিয়ে গিয়েচে।—ভাদ্রের শেষে আউশ ধান চাষীদের ঘরে উঠলে তবে আবার কিছু ধান ঘরে আসবে, ছেলেপুলেরা দু-বেলা পেট পুরে খেতে পাবে।

নেপাল ও গোপাল ক্ষুদিরামের দুই ছেলে। নেপালের বয়স বছর বারো, গোপালের দশ। ক'দিন থেকে পেট ভরে না-খেতে পেয়ে ওরা দুই ভায়েই সংসারের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেচে।

নেপাল বললে, "এই গোপলা, ক্ষিদে পেয়েচে না তোর?"

গোপাল ছিপ চাঁচতে চাঁচতে বললে, "হুঁ, দাদা!"

"মাকে গিয়ে বল্; আমারও পেট চুঁই চুঁই করচে।"

"মা বকে; তুমি যাও দাদা!"

"বকুক গে। আমার নাম করে মাকে বলতে পারবি নে?"

এমন সময় পাড়ার শিবু বাঁড়ুজ্যের ছেলে চুনিকে আসতে দেখে নেপাল ডাকলে, "ও চুনি, শুনে যা!"

চুনি বয়সে নেপালের চেয়ে বড়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে, বেশ চেহারা। নেপালের ডাকে সে ওদের উঠোনের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, "কি?"

"আয় না ভেতরে।"

"না যাবো না, বেলা যাচ্ছে। আমি জটি পিসীমাদের বাড়ি যাচ্ছি। মা সেখানে রয়েচে কিনা, ডাকতে যাচ্ছি।"

"কেন, তোর মা এখন সেখানে যে?"

"ওদের ডাল ভাঙতে গিয়েচে। তালনবমীর বের্তো আসচে এই মঙ্গলবার; ওদের বাড়ি লোকজন খাবে।"

"সত্যি?"

"তা জানিস নে বুঝি? আমাদের বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করবে। গাঁয়েও বলবে।"

"আমাদেরও করবে?"

"সবাইকে যখন নেমন্তন্ন করবে, তোদের কি বাদ দেবে?"

চুনি চলে গেলে নেপাল ছোট ভাইকে বললে, "আজ কি বার রে? তা তুই কি জানিস? আজ শুক্কুরবার বোধহয়। মঙ্গলবারে নেমন্তন্ন।"

গোপাল বললে, "কি মজা! না দাদা?"

"চুপ করে থাক,—তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই; তালনবমীর বের্তোর তালের বড়া করে, তুই

জানিস?"

গোপাল সেটা জানতো না! কিন্তু দাদার মুখে শুনে খুব খুশি হয়ে উঠলো। সত্যিই তা যদি হয়, তবে সে সুখাদ্য খাবার সম্ভাবনা বহুদূরবর্তী নয়, ঘনিয়ে এসেচে কাছে। আজ কি বার সে জানে না, সামনের মঙ্গলবারে। নিশ্চয় তার আর বেশি দেরি নেই।

দাদার সঙ্গে বাড়ি যাবার পথে পড়ে জটি পিসীমার বাড়ি। নেপাল বললে, "তুই দাঁড়া, ওদের বাড়ি ঢুকে দেখে আসি। ওদের বাড়ি তালের দরকার হবে, যদি তাল কেনে।"

এ গ্রামের মধ্যে তালের গাছ নেই। মাঠে প্রকাণ্ড তালদীঘি, নেপাল সেখান থেকে তাল কুড়িয়ে এনে গাঁয়ে বিক্রি করে।

জটি পিসীমা সামনেই দাঁড়িয়ে। তিনি গ্রামের নটবর মুখুজ্যের স্ত্রী, ভালো নাম হরিমতী; গ্রামসুদ্ধ ছেলে-মেয়ে তাঁকে ডাকে জটি পিসীমা।

পিসীমা বললেন, "কি রে?"

"তাল নেবে পিসীমা?"

"হ্যাঁ, নেব বই কি। আমাদের তো দরকার হবে মঙ্গলবার।"

ঠিক এই সময় দাদার পিছু পিছু গোপালও এসে দাঁড়িয়েচে। জটি পিসীমা বললেন, "পেছনে কে রে? গোপাল? তা সন্ধ্যেবেলা দুই ভায়ে গিয়েছিলি কোথায়?"

নেপাল সলজ্জমুখে বললে, "মাছ ধরতে।"

"পেলি?"

"ওই দুটো পুঁটি আর একটা ছোট বেলে···তাহলে যাই পিসীমা?"

"আচ্ছা, এসোগে বাবা, সন্ধ্যে হয়ে গেল; অন্ধকারে চলাফেরা করা ভালো নয় বর্ষাকালে।"

জটি পিসীমা তাল সম্বন্ধে আর কোনও আগ্রহ দেখালেন না বা তালনবমীর ব্রত উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ করার উল্লেখও করলেন না,—যদিও দুজনেরই আশা ছিল হয়তো জটি পিসীমা তাদের দেখলেই নিমন্ত্রণ করবেন এখন। দরজার কাছে গিয়ে নেপাল আবার পেছন ফিরে জিগ্যেস করলে, "তাল নেবেন তা হলে?"

"তাল? তা দিয়ে যেও বাবা। ক'টা করে পয়সায়?"

"দুটো করে দিচ্ছি পিসীমা। তা নেবেন আপনি, তিনটে করেই নেবেন।"

"বেশ কালো হেঁড়ে তাল তো? আমাদের তালের পিঠে হবে তালনবমীর দিন—ভালো তাল চাই।"

"মিশ্‌কালো তাল পাবেন। দেখে নেবেন আপনি।"

গোপাল বাইরে এসেই দাদাকে বললে, "কবে তাল দিবি দাদা?"

"কাল।"

"তুই ওদের কাছে পয়সা নিস নে দাদা!"

নেপাল আশ্চর্য হয়ে বললে, "কেন রে?"

"তাহলে আমাদের নেমন্তন্ন করবে না, দেখিস এখন।"

"দূর! তা হয় না। আমি কষ্ট করে তাল কুড়বো—আর পয়সা নেবো না?"

রাত্রে বৃষ্টি নামে। হু হু বাদলার হাওয়া সেই সঙ্গে। পুবদিকের জানলার কপাট দড়িবাঁধা; হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে সারারাত খট্‌খট্ শব্দ করে ঝড়বৃষ্টির দিনে। গোপালের ঘুম হয় না, তার যেন ভয় ভয় করে। সে শুয়ে শুয়ে ভাবচে—দাদা তাল যদি বিক্রি করে,—তবে ওরা আর

নেমন্তন্ন করবে না। তা কখনও করে?

খুব ভোরবেলা উঠে গোপাল দেখলে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। কেউই তখন ওঠে নি। রাত্রের বৃষ্টি থেমে গিয়েচে,—সামান্য একটু টিপটিপ বৃষ্টি পড়চে। গোপাল একছুটে চলে গেল গ্রামের পাশে সেই তালদীঘির ধারে। মাঠে এক হাঁটু জল আর কাদা। গ্রামের উত্তরপাড়ার গণেশ কাওরা লাঙল ঘাড়ে এই এত সকালে মাঠে যাচ্ছে। ওকে দেখে বললে, "কি খোকা ঠাকুর, যাচ্ছ কনে এত ভোরে?"

"তাল কুড়ুতে দীঘির পাড়ে।"

"বড্ড সাপের ভয় খোকাঠাকুর! বর্ষাকালে ওখানে যেও না একা-একা।"

গোপাল ভয়ে ভয়ে দীঘির তালপুকুরের তালের বনে ঢুকে তাল খুঁজতে লাগলো। বড় আর কালো কুচকুচে একটা মাত্র তাল প্রায় জলের ধারে পড়ে; সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে আসবার পথে আরও গোটা-তিনেক ছোট তাল পাওয়া গেল। ছেলেমানুষ, এত তাল বয়ে আনার সাধ্য নেই, দুটি মাত্র তাল নিয়ে সোজা একেবারে জটি পিসীমার বাড়ি হাজির।

জটি পিসীমা সবেমাত্র সদর দোর খুলে দোরগোড়ায় জলের ধারা দিচ্ছেন, ওকে এত সকালে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "কিরে খোকা?"

গোপাল একগাল হেসে বললে, "তোমার জন্যে তাল এনিচি পিসীমা!"

জটি পিসীমা আর কিছু না বলে তাল দুটো হাতে করে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন।

গোপাল একবার ভাবলে, তালনবমী কবে জিগ্যেস করে; কিন্তু সাহসে কুলোয় না তার। সারাদিন গোপালের মন খেলাধুলোর ফাঁকে কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ঘন বর্ষার দুপুরে, মুখ উঁচু করে দেখে—নারকোল গাছের মাথা থেকে পাতা বেয়ে জল ঝরে পড়চে, বাঁশ ঝাঁড় নুয়ে নুয়ে পড়চে বাদলার হাওয়ায়, বকুলতলার ডোবায় কট্‌কটে ব্যাঙের দল থেকে থেকে ডাকচে।

গোপাল জিগ্যেস করলে, "ব্যাংগুলো আজকাল তেমন ডাকে না কেন মা?"

গোপালের মা বলেন, "নতুন জলে ডাকে, এখন পুরোনো জলে তত আমোদ নেই ওদের।"

"আজ কি বার, মা?"

"সোমবার। কেন রে? বারের খোঁজে তোর কি দরকার?"

"মঙ্গলবারে তালনবমী, না মা?"

"তা হয়তো হবে। কি জানি বাপু! নিজের হাঁড়িতে চাল জোটে না, তালনবমীর খোঁজে কি দরকার আমার?"

সারাদিন কেটে গেল। নেপাল বিকেলের দিকে জিগ্যেস করলে, "জটি পিসীমার বাড়িতে তাল দিইছিলি আজ সকালে? কোথায় পেলি তুই? আমি তাল দিতে গেলে পিসী বললেন, 'গোপাল তাল দিয়ে গেচে, পয়সা নেয় নি।'—কেন দিতে গেলি তুই? একটা পয়সা হলে দুজনে মুড়ি কিনে খেতাম!"

"ওরা নেমন্তন্ন করবে, দেখিস দাদা, কাল তো তালনবমী!"

"সে এমনিই নেমন্তন্ন করবে, পয়সা নিলেও করবে। তুই একটা বোকা!"

"আচ্ছা দাদা, কাল তো মঙ্গলবার না?"

"হুঁ।"

রাত্রে উত্তেজনায় গোপালের ঘুম হয় না। বাড়ির পাশের বড় বকুল গাছটায় জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে; জানলা দিয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবে—কাল সকালটা হলে হয়। কতক্ষণে যে রাত পোহাবে!···

জটি পিসীমা আদর করে ওকে বললেন খাওয়ানোর সময়, "খোকা, কাঁকুড়ের ডাল্‌না আর নিবি? মুগের ডাল বেশি করে মেখে নে।" জটি পিসীমার বড় মেয়ে লাবণ্য-দি একখানা থালায় গরম-গরম তিল-পিটুলি ভাজা এনে ওর সামনে ধরে হেসে বললেন, "খোকা, ক'খানা নিবি তিল-পিটুলি?"—বলেই লাবণ্য-দি থালাখানা উপুড় করে তার পাতে ঢেলে দিলে। তার পর জটি পিসীমা আনলেন পায়েস আর তালের বড়া। হেসে বললেন "খোকা যাই তাল কুড়িয়ে দিয়েছিলি, তাই পায়েস হল!···খা, খা,—খুব খা—আজ যে তালনবমী রে!"···কত কি চমৎকার ধরনের রাঁধা তরকারির গন্ধ—বাতাসে! খেজুর গুড়ের পায়েসের সুগন্ধ—বাতাসে! গোপালের মন খুশি ও আনন্দে ভরে উঠলো। সে বসে বসে খাচ্ছে, কেবলই খাচ্ছে!···সবারই খাওয়া শেষ, ও তবুও খেয়েই যাচ্ছে···লাবণ্য-দি হেসে হেসে বলছে, "আর নিবি তিল-পিটুলি?"···

"ও গোপাল?"

হঠাৎ গোপাল চোখ চেয়ে দেখলে—জানলার পাশে বর্ষার জলে ভেজা ঝোপ-ঝাড়, তাদের সেই আতা গাছটা···সে শুয়ে আছে তাদের বাড়িতে। মার হাতের মৃদু ঠেলায় ঘুম ভেঙেচে, মা পাশে দাঁড়িয়ে বলচেন, "ওঠ ওঠ বেলা হয়েচে কত! মেঘ করে আছে তাই বোঝা যাচ্ছে না।"

বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে সে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আজ কি বার, মা···?"

"মঙ্গলবার।"

তাও-তো বটে! আজই তো তালনবমী! ঘুমের মধ্যে ওসব কি হিজিবিজি স্বপ্ন সে দেখছিল!

বেলা আরও বাড়লো, ঘন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার দিনে যদিও বোঝা গেল না বেলা কতটা হয়েচে। গোপাল দরজার সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ঠায় বসে রইলো। বৃষ্টি নেই একটুও, মেঘ-জমকালো আকাশ। বাদলের সজল হাওয়ায় গা সিরসির করে। গোপাল আশায় আশায় বসে রইলো বটে, কিন্তু কই, পিসীমাদের বাড়ি থেকে কেউ তো নেমন্তন্ন করতে এল না!

অনেক বেলায় তাদের পাড়ার জগবন্ধু চক্কোত্তি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে সামনের পথ দিয়ে কোথায় যেন চলেছেন। তাদের পেছনে রাখাল রায় ও তাঁর ছেলে সানু; তার পেছনে কালীবর বাঁড়ুজ্যের বড় ছেলে পাঁচু আর ও-পাড়ার হরেন···

গোপাল ভাবলে, এরা যায় কোথায়?

এ-দলটি চলে যাবার কিছু পরে বুড়ো নবীন ভট্‌চাজ ও তার ছোট ভাই দীনু, সঙ্গে এক পাল ছেলেমেয়ে নিয়ে চলেচে।

দীনু ভট্‌চাজের ছেলে কুড়োরাম ওকে দেখে বললে, "এখানে বসে কেন রে? যাবিনে?"

গোপাল বললে, "কোথায় যাচ্ছিস তোরা?"

"জটি পিসীমাদের বাড়ি তালনবমীর নেমন্তন্ন খেতে। করে নি তোদের? ওরা বেছে বেছে বলেচে কিনা, সবাইকে তো বলেনি···"

গোপাল হঠাৎ রাগে, অভিমানে যেন দিশেহারা হয়ে গেল। রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "কেন করবে না আমাদের নেমন্তন্ন? আমরা এর পরে যাবো···"

রাগ করবার মতো কি কথা সে বলেচে বুঝতে না পেরে কুড়োরাম অবাক হয়ে বললে, "বারে! তা অত রাগ করিস কেন? কি হয়েচে?"

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের চোখে জল এসে পড়লো—বোধ হয় সংসারের অবিচার দেখেই। পথ চেয়ে সে বসে আছে কদিন থেকে! কিন্তু তার কেবল পথ চাওয়াই সার হল? তার সজল ঝাপসা দৃষ্টির সামনে পাড়ার হারু, হিতেন, দেবেন, গুট্‌কে তাদের বাপ-কাকাদের সঙ্গে একে একে তার বাড়ির সামনে দিয়ে জটি পিসীমাদের বাড়ির দিকে চলে গেল···

রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ

জীবনে অনেক জিনিস ঘটে, যাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি। জানি না, হয়তো খুঁজিতে জানিলে তাহাদেরও সহজ ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ বাহির করা যায়। মানুষের বিচার, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণ হয়তো তাহাদের থাকিতে পারে—ইহা লইয়া তর্ক উঠাইব না, শুধু এইটুকু বলিব, সেরূপ কারণ যদিও থাকে—আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারা তাহার আবিষ্কার হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাদিগকে অতিপ্রাকৃত বলা হয়।

আমার জীবনে একবার এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার যুক্তি-যুক্ত কারণ তখন বা আজ কোনদিনই খুঁজিয়া পাই নাই—পাঠকদের কাছে তাই সেটি বর্ণনা করিয়াই আমি খালাস; তাঁহারা যদি সে রহস্যের কোনও স্বাভাবিক সমাধান নির্দেশ করিতে পারেন, যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিব।

ঘটনাটা এইবার বলি।

কয়েক বছর আগেকার কথা। মানভূম জেলার চেরো নামক গ্রামের মাইনর স্কুলে তখন মাস্টারি করি।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, চেরো গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনতর যে এখানে কিছুদিন বসবাস করিলে বাঙলাদেশের একঘেয়ে সমতলভূমির কোনও পল্লী আর চোখে ভালো লাগে না। একটি অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালু সানুদেশ জুড়িয়া লম্বালম্বি ভাবে সারা গ্রামের বাড়িগুলি অবস্থিত—সর্বশেষ সারির বাড়িগুলির খিড়কি দরজা খুলিলেই দেখা যায় পাহাড়ের উপরকার শাল, মহুয়া, কুরীচ, বিল্ববৃক্ষের পাতলা জঙ্গল, একটা সুবৃহৎ বটগাছ ও তাহার তলায় বাঁধানো বেদী, ছোট বড় শিলাখণ্ড ও ভেলা কাঁটার ঝোপ।

আমি যখন প্রথম ও-গ্রামে গেলাম তখন একদিন পাহাড়ের মাথায় বেড়াইতে উঠিয়া এক জায়গায় শালবনের মধ্যে একটি পাথরের ভাঙা মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সঙ্গে ছিল আমার দুটি উপরের ক্লাসের ছাত্র—তাহারা মানভূমবাসী বাঙালী। একটা কথা—চেরো গ্রামে বেশির ভাগ অধিবাসী মাদ্রাজী, যদিও তাহারা বেশ বাংলা বলিতে পারে,

অনেকে বাংলা আচার-ব্যবহারও অবলম্বন করিয়াছে। কি করিয়া মানভূম জেলার মাঝখানে এতগুলি মাদ্রাজী অধিবাসী আসিয়া বসবাস করিল, তাহার ইতিহাস আমি বলিতে পারি না।

মন্দিরটি কালো পাথরের এবং একটু অদ্ভুত গঠনের। অনেকটা যেন চাঁচড়া রাজবাড়ির দশমহাবিদ্যার মন্দিরের মতো ধরনটা—এ অঞ্চলে এরূপ গঠনের মন্দির আমার চোখে পড়ে নাই—তা ছাড়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও বিগ্রহশূন্য। দক্ষিণের দেওয়ালের পাথরের চাঁই কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, দরজা নাই, শুধু আছে পাথরের চৌকাঠ। মন্দিরের মধ্যে ও চারিপাশে বনতুলসীর ঘন জঙ্গল—সান্ধ্য আকাশের পটভূমিতে সেই পাথরের বিগ্রহহীন ভাঙা মন্দির আমার মনে কেমন এক অনুভূতির সঞ্চার করিল। আশ্চর্যের বিষয়,—অনুভূতিটা ভয়ের। ভাঙা মন্দির দেখিয়া মনে ভয় কেন হইল একথা তারপর বাড়ি ফিরিয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছি। তবুও অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলাম মন্দিরটা ভালো করিয়া দেখিতে, একজন ছাত্র বাধা দিয়া বলিল, "যাবেন না স্যার ওদিকে…"

"কেন?"

"জায়গাটা ভালো না। সাপের ভয় আছে সন্ধ্যেবেলা। তা ছাড়া লোকে বলে অনেক রকম ভয়ভীত আছে—মানে অমঙ্গলের ভয়। কেউ ওদিকে যায় না।"

"ওটা কি মন্দির?"

"ওটা রঙ্কিণীদেবীর মন্দির, স্যার! কিন্তু আমাদের গাঁয়ের বুড়ো লোকেরাও কোনদিন ওখানে পুজো হতে দেখে নি—মূর্তিও নেই বহুকাল। ওইরকম জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলেরও আগে থেকে।…চলুন স্যার নামি।"

ছেলে দুটা যেন একটু বেশি তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল নামিবার জন্য।

রঙ্কিণীদেবী বা তাঁহার মন্দির সম্বন্ধে দু-একজন বৃদ্ধ লোককে ইহার পর প্রশ্নও করিয়াছিলাম—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারা কথাটা এড়াইয়া যাইতে চায় যেন, আমার মনে হইয়াছে রঙ্কিণী দেবী সংক্রান্ত কথাবার্তা বলিতেও তাহারা ভয় পায়।

আমিও আর সে-বিষয়ে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা ছাড়িয়া দিলাম।

বছর খানেক কাটিয়া গেল।

স্কুলে ছেলে কম, কাজকর্ম খুব হালকা, অবসর সময়ে এ-গ্রামে ও-গ্রামে বেড়াইয়া এ অঞ্চলের প্রাচীন পট, পুঁথি, ঘট ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এ বাতিক আমার অনেকদিন হইতেই আছে। নূতন জায়গায় আসিয়া বাতিকটা বাড়িয়া গেল।

চেরো গ্রাম হইতে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে জয়চণ্ডী পাহাড়। এখানে খাড়া উঁচু একটা অদ্ভুত গঠনের পাহাড়ের মাথায় জয়চণ্ডী ঠাকুরের মন্দির আছে। পৌষ মাসে বড় মেলা বসে। বি.এন.আর লাইনের একটা ছোট স্টেশনও আছে এখানে।

এই পাহাড়ের কাছে একটি ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক ঘর মানভূমপ্রবাসী উড়িয়া ব্রাহ্মণের বাস। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহন পাণ্ডা নামে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হইয়া গেল—তিনি বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় আমার সঙ্গে অনেক রকমের গল্প করিতেন। পট, পুঁথি, ঘট সংগ্রহের অবকাশে আমি জয়চণ্ডীতলা গ্রামে চন্দ্রমোহন পাণ্ডার নিকট বসিয়া তাঁহার মুখে এদেশের কথা শুনিতাম। চন্দ্র পাণ্ডা আবার স্থানীয় ডাকঘরের পোস্টমাস্টারও। এদেশে প্রচলিত কত রকম আজগুবি ধরনের সাপের, ভূতের, ডাকাতের ও বাঘের (বিশেষ করিয়া বাঘের—কারণ বাঘের উপদ্রব এখানে খুব বেশি) গল্প যে বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শুনিয়াছি এবং এই সব গল্প শুনিবার লোভে কত আষাঢ়ের ঘন বর্ষার দিনে বৃদ্ধ

পোস্টমাস্টারের বাড়িতে গিয়া যে হানা দিয়াছি, তাহার হিসাব দিতে পারিব না।

মানভূমের এই সব আরণ্য অঞ্চল সভ্যজগতের কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত, এখানকার জীবনযাত্রাও একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যতই অদ্ভুত ধরনের গল্প হউক, জয়চণ্ডী পাহাড়ের ছায়ায় শালবন-বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বৃদ্ধ চন্দ্র পাণ্ডার বাঁকা বাঁকা মানভূমের বাংলায় সেগুলি শুনিবার সময় মনে হইত—এদেশে এরূপ ঘটিবে ইহা আর বিচিত্র কি! কলিকাতা বালিগঞ্জের কথা তো ইহা নয়।

কথায় কথায় চন্দ্র পাণ্ডা একদিন বলিলেন, "চেরো পাহাড়ে রঙ্কিণী দেবীর মন্দির দেখচেন?" আমি একটু আশ্চর্য হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলাম।

রঙ্কিণী দেবী সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমি আর কোনও কথা কাহারও মুখে শুনি নাই, সেদিন সন্ধ্যায় আমার ছাত্রটির নিকট যাহা সামান্য কিছু শুনিয়াছিলাম, তাহা ছাড়া।

বলিলাম, "মন্দির দেখেচি, কিন্তু রঙ্কিণী দেবীর কথা জানবার জন্যে যাকেই জিগ্যেস করেচি সেই চুপ করে গিয়েচে কিংবা অন্য কথা পেড়েচে—এর কারণ কিছু বলবেন?"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "রঙ্কিণী দেবীর নামে সবাই ভয় খায়।"

"কেন বলুন তো?"

"মানভূম জেলায় আগে অসভ্য বুনো জাত বাস করতো। তাদেরই দেবতা উনি। ইদানীং হিন্দুরা এসে যখন বাস করলে, উনি হিন্দুদেরও ঠাকুর হয়ে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে কেউ মন্দির করে দিলে। কিন্তু রঙ্কিণী দেবী হিন্দু দেব-দেবীর মত নয়, অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর—আগে ওই মন্দিরে নরবলি হত—ষাট বছর আগেও রঙ্কিণী মন্দিরে নরবলি হয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করে রঙ্কিণী দেবী অসন্তুষ্ট হলে রক্ষা নেই—অপমৃত্যু আর অমঙ্গল আসবে তাহলে। এরকম অনেকবার হয়েচে নাকি। একটা প্রবাদ আছে এ অঞ্চল, দেশে মড়ক হবার আগে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়া রক্তমাখা দেখা যেত। আমি যখন প্রথমে এদেশে আসি, সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা—তখন প্রাচীন লোকদের মুখে একথা শুনেছিলাম।

"রঙ্কিণী দেবীর বিগ্রহ দেখেছিলেন মন্দিরে?"

"না, আমি এসে পর্যন্ত ওই ভাঙা মন্দিরই দেখচি। এখান থেকে কারা বিগ্রহটি নিয়ে যায়, অন্য কোন্ দেশে। রঙ্কিণী দেবীর এসব কথা আমি শুনতাম ওই মন্দিরের সেবাইত বংশের এক বৃদ্ধের মুখে। তাঁর বাড়ি ছিল ওই চেরো গ্রামেই। আমি প্রথম যখন এদেশে আসি—তখন তার বাড়ি অনেকবার গিয়েচি। দেবীর খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার কথাও তাঁর মুখে শুনি। এখন তাঁদের বংশে আর কেউ নেই। তার পর চেরো গ্রামেও আর বহুদিন যাই নি—বয়েস হয়েচে, বড় বেশি কোথাও বেরুই নে।"

'বিগ্রহের মূর্তি কি?"

"শুনেছিলাম কালীমূর্তি। আগে নাকি হাতে সত্যিকার নরমুণ্ড থাকতো অসভ্যদের আমলে। কত নরবলি হয়েচে তার লেখা-জোখা নেই—এখনও মন্দিরের পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঢিবি আছে—খুঁড়লে নরমুণ্ড পাওয়া যায়।"

সাধে এদেশের লোক ভয় পায়! শুনিয়া সন্ধ্যার পরে জয়চণ্ডীতলা হইতে ফিরিবার পথে আমারই গা ছমছম করিতে লাগিল।

আরও বছর দুই সুখে-দুঃখে কাটিল। জায়গাটা আমার এত ভালো লাগিয়াছিল যে হয়তো সেখানে আরও অনেকদিন থাকিয়া যাইতাম—কিন্তু স্কুল লইয়াই বাঙালীদের সঙ্গে মাদ্রাজীদের বিবাদ বাধিল। মাদ্রাজীরা স্কুলের জন্যে বেশি টাকাকড়ি দিত, তাহারা দাবি করিতে

লাগিল কমিটিতে তাহাদের লোক বেশি থাকিবে—ইংরাজির মাস্টার একজন মাদ্রাজী রাখিতেই হইবে, ইত্যাদি। আমি ইংরাজি পড়াইতাম—মাঝে হইতে আমার চাকুরি রাখা দায় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আমাদের দেশে একটি হাই স্কুল হইয়াছিল, পূর্বে একবার তাহারা আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ম্যালেরিয়ার ভয়ে যাইতে চাহি নাই—এখন বেগতিক বুঝিয়া দেশে চিঠি লিখিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব কারণে চেরো গ্রামের মাস্টারি আমায় ছাড়িতে হয় নাই। কিসের জন্য ছাড়িয়া দিলাম পরে সে কথা বলিব।

এই সময় একদিন চন্দ্র পাণ্ডা চেরো গ্রামে কি কার্য উপলক্ষে আসিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম আমার বাসায় একটু চা খাইতে হইবে। তাঁহার গরুর গাড়ি সমেত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাসাবাড়িতে আনিলাম।

বৃদ্ধ ইতিপূর্বে কখনও আমার বাসায় আসেন নাই; বাড়িতে ঢুকিয়াই চারিদিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "এই বাড়িতে থাকেন আপনি?"

বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট্ট গাঁ, বাড়ি তো পাওয়া যায় না—আগে স্কুলের একটা ঘরে থাকতাম। বছর খানেক হল স্কুলের সেক্রেটারি রঘুনাথন্ এটা ঠিক করে দিয়েচেন।"

পুরানো আমলের পাথরে গাঁথুনির বাড়ি। বেশ বড় বড় তিনটি কামরা, একদিকে একটু সরু যাতায়াতের বারান্দা। জবরদস্ত গড়ন, যেন খিলজিদের আমলের দুর্গ কি জেলখানা—হাজার ভূমিকম্পেও এ বাড়ির একটু চুন বালি খসাইতে পারিবে না। বৃদ্ধ বসিয়া আবার বাড়িটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলাম বাড়ীটার গড়ন তাঁহার ভালো লাগিয়াছে, বলিলাম, "সেকালের গড়ন, খুব টন্‌কো—আগাগোড়া পাথরের।"

চন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন, "না, সেজন্যে নয়। আমি এই বাড়িতে প্রায় ত্রিশ বছর আগে যথেষ্ট যাতায়াত করতাম—এই বাড়িই হ'ল রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত বংশের। ওদের বংশে এখন আর কেউ নেই। আপনি যে এ বাড়িতে আছেন তা জানতাম না।···তা বেশ বেশ। অনেকদিন পরে বাড়িটাতে ঢুকলাম কিনা, আমার বড় অদ্ভুত লাগচে। তখন বয়েস ছিল ত্রিশ, আর এখন হল প্রায় ষাট।" তারপর অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। চা পান করিয়া বৃদ্ধ গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

আরও বছর খানেক কাটিয়াছে। দেশের স্কুলে চাকুরির আশ্বাস পাইলেও আমি এখনও যাই নাই, কারণ এখানকার বাঙালী-মাদ্রাজী সমস্যা একরূপ মিটিয়া আসিয়াছে, আপাতত আমার চাকুরিটা বজায় রহিল বলিয়াই তো মনে হয়।

চৈত্র মাসের শেষ।

পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে আমারই এক ছাত্রের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম—মধ্যে রবিবার পড়াতে শনিবার গরুর গাড়ি করিয়া রওনা হই, রবিবার ও সোমবার থাকিয়া মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

বলা আবশ্যক বাসায় আমি একাই থাকি। স্কুলের চাকর রাখহরি আমার রাঁধে, এ কয়দিন স্কুলের ছুটি ছিল, রাখহরিকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বাহিরের দরজার তালা খুলিয়াই রাখহরি বলিয়া উঠিল, "এ, বাবু, এ কিসের রক্ত! দেখুন···"

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম।

তাই বটে! বাহিরের দরজায় চৌকাঠের ঠিক ভিতর দিক হইতেই রক্তের ধারা উঠান বাহিয়া যেন চলিয়াছে। একটানা ধারা নয়, ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা অবিচ্ছিন্ন সারি। একেবারে টাটকা রক্ত—এইমাত্র সদ্য যেন কাহারও মুণ্ড কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

আমি তো অবাক। কিসের রক্তের ধারা এ! কোথা হইতেই বা আসিল, আজ দুদিন তো বাসা বন্ধ ছিল—বাড়ির ভিতরের উঠানে রক্তের দাগ আসে কোথা হইতে—তাহার উপর সদ্য তাজা রক্ত!

অবশ্য কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুরের কথা মনে পড়িল। এ ক্ষেত্রে পড়াই স্বাভাবিক। চাকরকে বলিলাম, "দেখতো রে, রক্তটা কোন্ দিকে যাচ্চে—এ সেই বড় হুলো বেড়ালটার কাজ..."

রক্তের ধারাটা গিয়াছে দেখা গেল সিঁড়ির নিচের চোরকুঠুরির দিকে। ছোট্ট ঘর, ভীষণ অন্ধকার এবং যত রাজ্যের ভাঙাচোরা পুরনো মালে ভর্তি বলিয়া আমি কোনদিন চোরকুঠুরি খুলি নাই। চোরকুঠুরির দরজা পার হইয়া বন্ধ ঘরের মধ্যে রক্তের ধারাটার গতি দেখিয়া ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকাল ধরিয়া ঘরটা বাহির হইতে তালা বন্ধ, যদি বিড়ালের ব্যাপারই হয়, বিড়াল ঢুকিতেও তো ছিদ্রপথ দরকার হয়।

চোরকুঠুরির তালা লোহার শিকের চাড় দিয়া খোলা হইল। আলো জ্বালিয়া দেখা গেল ঘরটায় পুরনো ভাঙা, তোবড়ানো টিনের বাক্স, পুরনো ছেঁড়া গদি, খাটের পায়া, মরিচাধরা সড়কি, ভাঙা টিন, শাবল প্রভৃতি ঠাসা বোঝাই। ঘরের মেঝেতে সোজা রক্তের দাগ এক কোণের দিকে গিয়াছে—রাখহরি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি বাবু! এতে কি করে এমনধারা রক্ত লাগলো..."

তারপর সে কি একটা জিনিস হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখুন কাণ্ডটা বাবু..." জিনিসটাকে হাতে লইয়া সে বাহিরে আসিতে তাহার হাতের দিকে চাহিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।

একখানা মরিচাধরা হাতলবিহীন ভাঙা খাঁড়া বা রাম-দা—আগার দিকটা চওড়া ও বাঁকানো—বড় চওড়া ফলাটা তাজা রক্তে টকটকে রাঙা! একটু আধটু রক্ত নয়, ফলাতে আগাগোড়া রক্ত মাখানো, মনে হয় যেন খাঁড়াখানা হইতে এখনি টপ্‌টপ্ করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে!

সেই মুহূর্তে এক সঙ্গে আমার অনেক কথা মনে হইল। দুই বৎসর পূর্বে চন্দ্র পাণ্ডার মুখে শোনা সেই গল্প। রঙ্কিণী দেবীর সেবাইত বংশের ভদ্রাসন বাড়ি এটা। পুরানো জিনিসের গুদাম এই চোরকুঠুরিতে রঙ্কিণী দেবীর হাতের খাঁড়াখানা তাহারাই রাখিয়াছিল হয়তো। ...মড়কের আগে বিগ্রহের খাঁড়া রক্তমাখা হওয়ার প্রবাদ!

আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

মড়ক কোথায় ভাবিতে পারিতাম যদি সময় পাইতাম সন্দেহ করিবার। কিন্তু তাহা পাই নাই। পরদিন সন্ধ্যার সময় চেরো গ্রামে প্রথম কলেরা রোগীর খবর পাওয়া গেল। তিন দিনের মধ্যে রোগ ছড়াইয়া মড়ক দেখা দিল—প্রথমে চেরো, তারপর পাশের গ্রাম কাজরা, ক্রমে জয়চণ্ডীতলা পর্যন্ত মড়ক বিস্তৃত হইল। লোক মরিয়া ধুলধাবাড় হইতে লাগিল। চেরো গ্রামের মাদ্রাজী বংশ প্রায় কাবার হইবার যোগাড় হইল।

মড়কের জন্য স্কুল বন্ধ হইয়া গেল। আমি দেশে পলাইয়া আসিলাম; তারপর আর কখনও চেরোতে যাই নাই—গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বেই দেশের স্কুলের চাকুরিটা পাইয়াছিলাম।

সেই হইতে রঙ্কিণী দেবীকে মনে মনে ভক্তি করি! তিনি অমঙ্গলের পূর্বাভাস দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র। মূর্খ জনসাধারণ তাঁহাকেই অমঙ্গলের কারণ ভাবিয়া ভুল বোঝে।

মেডেল

কয়েক বছর পূর্বে এ ঘটনা ঘটেচে, তাই এখন মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যে; আমারই কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতার দরুন হয়তো চোখে ভুল দেখে থাকবো বা ওই রকম কিছু!—কিন্তু আমার মন বলে, তা নয়, ঘটনাটা মিথ্যে ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনও কারণ ঘটে নি। আমার তখনকারের অভিজ্ঞতাই সত্যি, এখন যা ভাবচি, তাই মিথ্যে।

ঘটনাটি খুলে বলা দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে গোড়াতেই একথা বলে রাখি যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে আমার শরীরে কোনও রোগ-বালাই নেই। আমার মন বা মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এবং যে সময়ের কথা বলচি, এখন থেকে বছর চারেক আগে, তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। আমার স্কুলমাস্টারের জীবনে অত্যাশ্চর্য বা অবিশ্বাস্য ধরনের কখনও কিছু দেখি নি। অন্য পাঁচজন স্কুলমাস্টারের মতোই অত্যন্ত সাধারণ ও একঘেয়ে রুটিন বাঁধা কর্তব্যের মধ্যে দিয়েই দিন কাটিয়ে চলেছি আজ বহু বৎসর।

সে বছর বর্ষাকালে, গরমের ছুটির কিছু পরে একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছি, এমন সময় একটি ছেলে আর একটি ছেলের সঙ্গে হাত-কাড়াকাড়ি করে কি একটা কেড়ে বা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করচে, আমার চোখে পড়লো। আমি ওদের দুজনকে অমনোযোগিতার জন্যে ধমক দিতে, অন্য একটি ছেলে বলে উঠলো, "স্যার, কামিখ্যে সুধীরের মেডেল কেড়ে নিচ্ছে···"

"কার মেডেল? কিসের মেডেল?"

সুধীর নামে ছেলেটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমার মেডেল, স্যার!"

অন্য ছেলেটির দিকে চেয়ে বললুম, "ওর মেডেল তুমি নিচ্ছিলে, কামিখ্যে?

কামিখ্যে ওরফে কামাখ্যাচরণ মৌলিক নামে ছেলেটি বললে, "নিচ্ছিলুম না স্যার, দেখতে চাইছিলুম; তা, ও দেবে না···"

"ওর মেডেল যদি ও না দেয়; তোমার কেড়ে নেবার কি অধিকার আছে? বোসো, ও রকম আর করবে না···"

কথা শেষ করে সুধীরের দিকে চেয়ে ক্লাসের ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সখ্য থাকার ঔচিত্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দেবার পরে ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম, "কই, কি মেডেল দেখি? কোথায় পেলে মেডেল?"

ভেবেছিলুম আজকাল কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে সব ব্যাডমিন্টন খেলা, সাঁতারের বা দৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারই কোন কিছুতে সুধীর হয়তো চতুর্থ স্থান বা ওই ধরনের কোনো সাফল্যলাভ করে ছোট্ট এতটুকু একটা আধুলির মতো মেডেল পেয়ে থাকবে—এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, সে সেটা ক্লাসে এনে পাঁচজনকে গর্ব-ভরে দেখাতে চাইবে; এমন কি এই ছুতো অবলম্বন করে ক্লাসসুদ্ধু হেডমাস্টারের কাছে দলবদ্ধ হয়ে গিয়ে একবেলার জন্যে ছুটিও চাইতে পারে। সুতরাং মেডেলটা যখন আমার হাতে এসে পৌঁছুলো, তখন সেটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হাত পেতে নিলুম; কিন্তু মেডেলটার দিকে একবার চেয়ে দেখেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসলুম। না, এ তো পাড়ার ব্যাড্‌মিন্টন ক্লাবের

বাজে মেডেল নয়, মেডেলটা পুরনো, বড় ও ভারি চমৎকার গড়ন!—কি জিনিস দেখি?

মেডেলের গায়ে কি লেখা রয়েচে, আধ-অন্ধকার ক্লাসরুমে ভালো পড়তে পারলুম না—ও-পিঠ উলটে দেখি, মহারানী ভিক্টোরিয়ার অল্প-বয়সের মূর্তি খোদাই করা। পকেটে চশমা নেই, মনে হল অফিস ঘরের টেবিলে ফেলে এসেচি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছেলে ভিড় করেচে আমার চেয়ারের চারিপাশে—মেডেল দেখবার জন্যে। তাদের ধমক দিয়ে বললুম, "যাও, বোসোগে সব, ভিড় কোরো না এখানে।"

একটা ছেলেকে বললুম, "কি লেখা আছে মেডেলের গায়ে পড়ো তো?"

ক্লাস ফোরের ছেলে—অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পড়লে, "ক্রাইমিয়া, সিবাস্টোপোল, ভিক্টোরিয়া রেজিনা···।"

"ও পিঠে?"

"সার্জেন্ট এস. বি. পার্কিন্‌স্, সিক্সথ্ ড্রাগন গার্ডস্—আঠারো শ' চুয়ান্ন সাল···"

দস্তুরমতো অবাক হয়ে গেলুম। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় সিবাস্টোপোলের রণক্ষেত্রে কোনও সাহসের কাজ করবার জন্যে এই মেডেল দেওয়া হয়েছিল ইংলন্ডের সামরিক দপ্তর থেকে ড্র্যাগন গার্ডস্ সৈন্যদলের সার্জেন্ট পার্কিন্‌স্‌কে। এ তো সাধারণ জিনিস মোটেই নয়!

ক্রাইমিয়া···সিবাস্টোপোল? ···চার্জ অফ দি লাইট ব্রিগেড্! কিন্তু কলকাতার নীলমণি দাসের লেনের সুধীর সাহার কাছে সে মেডেল কোথা থেকে আসে।

"এদিকে এসো, এ মেডেল কোথায় পেয়েচ?"

"ওটা আমার স্যার!"

"তোমার তা বুঝলুম। পেলে কোথায়?"

"আমার দাদু দিয়েচেন স্যার।"

"তোমার দাদু কোথায় পেয়েছিলেন জানো?

"হ্যাঁ, স্যার, জানি। আমার দাদুর বাবার কাছে এক সাহেব জমা রেখে গিয়েছিল।"

"কি ভাবে?"

"আমাদের মদের দোকান ছিল কিনা, স্যার! মদ খেয়ে টাকা কম পড়লে ওটা বাঁধা রেখে গিয়েছিল, আর নিয়ে যায় নি—দাদুর মুখে শুনেচি।"

হিসেব করে দেখলুম ছিয়াশি উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে সেই বছরটি থেকে, যে বছরে সার্জেন্ট পার্কিন্‌স্ (সে যেই হোক) এ মেডেল পায়। তখন তার বয়স যদি কুড়ি বছরও থেকে থাকে, এখন তার বয়স হওয়া উচিত একশো ছয়। সুতরাং সে মরে ভূত হয়ে গেছে কোন্ কালে।

সেদিন ছিল শনিবার, সকাল সকাল স্কুল ছুটি হবে এবং অনেক দিন পরে সেদিন দেশে যাবো পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলুম। আমার এক গ্রাম-সম্পর্কে জ্যাঠামশায় ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, বেশ পড়াশুনো আছে, গ্রামেই থাকেন। ভাবলুম, তাঁকে মেডেলটা দেখালে খুশি হবেন খুব। সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটি চেয়ে নিলুম, সোমবারে ফেরত দোব বললুম। স্কুলের ছুটির পরে বাসা থেকে সুটকেসটি নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে আড়াইটের গাড়ি ধরলুম। দেশের স্টেশনে যখন নামলুম, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। দু'মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই হয়তো পৌঁছুতে পারা যেত—কিন্তু আমি খুব জোরে হাঁটি নি।

ভাদ্র মাসের শেষ, অথচ বৃষ্টি তত বেশি না-হওয়ায় পথ-ঘাট বেশ শুকনো খটখটে।

পথের ধারের বর্ষা-শ্যামল গাছপালা চোখে বড় ভালো লাগছিল অনেক দিন কলকাতা বাসের পরে—তাই জোরে পা না-চালিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিলুম। এখানে প্রথমেই বলি, আমার বাড়িতে কেউ থাকে না। পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধা, আমি গেলে রান্না করে দিয়ে আসতেন বরাবর। আমার এক বাল্যবন্ধু বৃন্দাবন, অনেক বছর ধরে বিদেশে থাকে, পিসিমার মুখে শুনলুম, আজ দিন পনেরো হল বৃন্দাবন বাড়ি এসেচে। শুনে বড় আনন্দ হল, সন্ধ্যার পরেই ওর সঙ্গে দেখা করবো ঠিক করে, চা খেয়ে নদীর ধারে বেড়াতে বার হলুম—যাবার সময় সুটকেসটা খুলে মেডেলটা পকেটে নিলুম, বৃন্দাবনকেও দেখাবো।

নদীর ধারে গিয়ে দেখি—বর্ষার দরুন নদীর জল ভয়ানক বেড়েচে, নদীর জল কূল ছাপিয়ে দু'ধারের মাঠে পড়েচে। অনেকক্ষণ বসে রইলুম, সন্ধ্যার অন্ধকার নামলো একটু একটু, বাদুড়ের দল বাসায় ফিরচে। কেউ কোনো দিকে নেই।—এক জায়গায় বর্ষার তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে গিয়েচে। অনেকটা উঁচু পাড়, নিচে খরস্রোতা বর্ষার নদী। জায়গাটা দিয়ে যেতে যেতে একবার কি-রকম ভেঙেচে দেখবার ইচ্ছে গেল। পাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে নিচে জলের আবর্ত দেখচি, পাড়টা সেখানে অনেকখানি উঁচু, জল অনেক নিচে—হঠাৎ আমার মনে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জেগে উঠলো—আমি লাফ দিয়ে পাড় থেকে জলে পড়বো!···দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ইচ্ছাটা যেন ক্রমে বেড়ে উঠচে···লাফাই···দিই লাফ···! অথচ বর্ষার খরস্রোতা নদী, কুটো ফেললে দু'খানা হয়ে যায়! আমি সাঁতার জানি না,—গভীর জল পাড়ের নিচেই। ইচ্ছাটা কিছুতেই যেন সামলাতে পারচিনে! এমন কি আমার মনে হল আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাকে লাফ দিতেই হবে, নইলে আমার জীবনের সুখ চলে যাবে!···

তাড়াতাড়ি নদীর পাড় থেকে একরকম জোর করেই চলে এলুম। কারণ যেন মনে হচ্ছিল এর পর আমার আর যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, পা দুটো যেন ক্রমশ সীসের মত ভারী হয়ে উঠচে—এর পর ওই বিপজ্জনক নদীর পাড় থেকে পা দুটোকে নাড়াবার ক্ষমতা চলে যাবে আমার!···

নদীর ধার থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ি আসবার পথে ও সব ইচ্ছে আর কিছু নেই। আমি নিজের মনোভাবে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম—কি অদ্ভুত! এ রকম হওয়ার মানে কি? ট্রেনে বসে অতিমাত্রায় ধূমপান করেছিলাম মনে পড়লো। এই ভাদ্র মাসের গরমে অত ধূমপান করা ঠিক হয় নি, তার ওপর বাড়ি এসে দু'তিন পেয়ালা চা খেয়েচি। এ সবেই ওরকমটা হয়ে থাকবে।—নিশ্চয়ই তাই।

বৃন্দাবনের বাড়ি গেলুম। বৃন্দাবনকে অনেক দিন পরে দেখে সত্যিই আনন্দ হল। দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত অনেক গল্প করলুম। অনেক-বছর-ধরে-জমানো অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী। বড় গরম আজ, কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। ভাদ্রমাসের গুমোট গরম। বৃন্দাবন বললেন, "চল ভাই, ছাদে গিয়ে বসে গল্প করি, তবুও একটু হাওয়া পাওয়া যাবে। ···তুই আমাদের এখানে খেয়ে যাবি—মা বলে দিয়েচেন। তোদের বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েচে।"

দু'জনে ছাদে উঠলুম। বাড়িটা দো-তলা। দো-তলার ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর আছে। আমি জানতুম, বৃন্দাবনের কাকা ওই ঘরটায় থাকেন। দো-তলার ছাদে উঠে দেখলুম—বাড়ির পেছন দিকটায় বাঁশের ভারা-বাঁধা। বললুম, "বাড়িতে রাজমিস্ত্রি খাটচে বুঝি, বৃন্দাবন?

"হ্যাঁ ভাই, কাকার ঘরটা মেরামত হবে; উত্তর দিকে দেওয়ালটার গা থেকে নোনা ধরা ইটগুলো বার করা হচ্ছে।"

বৃন্দাবন দোতলার ঘরটার মধ্যে ঢুকলো—আমার কিন্তু মনে কেমন একটা আস্থর ভাব! খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে গল্প করে আমি একটু জল খেতে চাইলুম। বৃন্দাবন জল আনতে নিচে নেমে গেল, আমি ছাদে পায়চারি করতে লাগলুম। ছাদে কেউ নেই। অন্ধকার ছাদটা। ···যে দিকটায় রাজমিস্ত্রিরা ভারা বেঁধে কাজ করচে, পায়চারি করতে করতে সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখচি, হঠাৎ আমার মনে হল—ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়িনে কেন?

বেশ হবে!···লাফ দেবো? প্রায় দুর্দমনীয় ইচ্ছা হল লাফ দেবার। লাফ দেওয়াই ভালো।···লাফ দিতেই হবে।···দিই লাফ···এমন সময় বৃন্দাবন ছাদের ওপর এসে বললে, "আয় ঘরের মধ্যে, মা চা পাঠিয়ে দিচ্ছেন; ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

আরও প্রায় আধ-ঘণ্টা কথা বলবার পরে, নিচে থেকে চা ও খাবার এসে পৌঁছুলো। আমারা দুই বন্ধুকে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করলুম। তারপর বৃন্দাবন খাওয়ার কতদূর যোগাড় হল দেখতে নিচে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে বড় গরম—আমি বাইরের ছাদে খোলা হাওয়ায় আবার বেড়াতে লাগলুম। রাজমিস্ত্রিদের ভারার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল—লাফ এবার দিতেই হবে। কেউ নেই ছাদে। কেউ বাধা দিতে আসবে না—এই উপযুক্ত অবসর! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের গভীর তলায় কে যেন বলচে—'লাফ দিও না, মূর্খ'! লাফ দিও না, পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবে।'···আমার মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করচে!···

কতক্ষণ পরে জানিনে, এবং কিসে থেকে কি হল তাও জানিনে,—হঠাৎ বৃন্দাবনের চিৎকারে আমার চমক ভাঙলো? দেখি, বৃন্দাবন আমাকে হাত ধরে টেনে তুলচে!

"একি সর্বনাশ! তুই লাফ দিয়ে পড়লি দেখলুম যেন! ভাগ্যিস, বাঁশে পা-বেঁধে গিয়েচে তাই রক্ষে···কি হল তোর?"

আমার মাথা যেন কেমন ঘুরছিল, গা ঝিমঝিম করছিল। বৃন্দাবনকে বললুম, "আমি ভাই কিছুই জানিনে তো?···"

বৃন্দাবন ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমায় শুইয়ে দিলে। সকলে বললে ট্রেনে আসার দরুন আর গরমে শরীর কি রকম খারাপ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম। আমি জানি মাথা ঘুরে পড়ে আমি যাই নি, লাফ আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছিলুম—তবে ঠিক যে সময়টাতে আমি লাফ দিয়েচি সে সময়ের কথাটা আমি অনেক চেষ্টা করে কিছুতেই মনে করতে পারলুম না।

বিছানায় শুয়ে বেশ সুস্থ বোধ করলুম। পাশ ফিরতে হঠাৎ যেন কি একটা শক্ত জিনিস বুকের কাছে ঠেকলো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি—সুধীরের সেই মেডেলটা।

আশ্চর্য, এটার কথা এতক্ষণ একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম! বৃন্দাবনকে সেটা দেখালুম। ওদের বাড়ির সকলে মেডেলটা হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে।

রাত্তিরে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। আমার বাড়িতে কেউ নেই বর্তমানে, একাই থাকি এক ঘরে। একটা জিনিস লক্ষ্য করচি; যখন থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে বার হয়ে পথে পা দিয়েছি, তখন থেকেই কেমন এক ধরনের ভয় করচে আমার! বাড়িতে যখন ঢুকলুম, তখন ভয়টা যেন বাড়লো। একা ঘরে কতবার এর আগে শুয়েচি—এমন ভয় হয় নি মনে কোন দিন। ···না, শরীরটা সত্যিই খারাপ। শরীর খারাপ থাকলে মনও দুর্বল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার শিয়রের কাছে একটা বড় জানলা—জানলা দিয়ে বাড়ির পেছনের বন-বাগান চোখে পড়ে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে—কৃষ্ণ-পক্ষের একাদশীর

জ্যোৎস্না। হাওয়া আসবে বলে জানলা খুলে রেখেছি। কতক্ষণ ঘুম হয়েছিল জানি নে, ঘণ্টা-খানেকের বেশি হবে না—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হতে লাগলো আমার শিয়রের দিকের জানলায় কে দাঁড়িয়ে! যেন মাথা তুলে সে দিকে চেয়ে দেখলেই তাকে দেখা যাবে! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভয় হল। অথচ কিসের যে ভয় জানিনে। এমন ভয় যে, কিছুতেই শিয়রের জানলার দিকে তাকাতে পারলুম না। চোখে না দেখলেও আমার বেশ মনে হল, জানলার গরাদেতে দুটো হাত রেখে কে দাঁড়িয়ে আছে—জ্বলন্ত চোখে সে আমার দিকে চেয়ে রয়েচে—আমি ওদিকে চাইলেই দেখতে পাবো।

প্রাণপণে চোখ বুজে শুয়ে রইলুম,—কিছুতেই চাইবো না। ঘুমুবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও কি ইঁদুর পচেছে? কিসের পচা গন্ধ? যেন আয়োডিন, লিন্ট, মলম প্রভৃতি উগ্র গন্ধের সঙ্গে পচা ক্ষতের গন্ধ মেশানো? এতকাল বাড়িতে থাকা নেই, যার ওপর বাড়ি ঘর পরিষ্কার রাখার ভার, সে কিছুই দেখাশোনা করে না বোঝা গেল।···

কে যেন আমার মনের ভেতর বলচে, "চেয়ে দেখ, তোমার মাথার শিয়রের জানলার দিকে চেয়ে দেখ না?"

ঘরের চারিধারে কিসের যেন একটা প্রভাব—কোনো অমঙ্গলজনক, হিংস্র, উগ্র, অশান্ত ধরনের ব্যাপারটা,—ঠিক বলে বোঝানো যায় না। আমি যেন ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সে এমন বিপদ, যা আমাকে মরণের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে—এমন কি সে দোরের চৌকাঠ পার করে অন্ধকার মৃত্যুপুরীর হিমশীতল নীরবতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতেও পারে!···

···আমি চাইবো না···কিছুতেই চাইবো না শিয়রের জানলার দিকে।

কিন্তু যে প্রভাবই হোক, আমার ঘরের মধ্যে, দেওয়ালের এ পিঠে তার অধিকার নেই। বহুকাল ধরে পূর্বপুরুষেরা বাস্তু শালগ্রামের অর্চনা করেচেন এ ঘরে···এর মধ্যে কারও কিছু খাটবে না। আমার মনই আবার এ কথাগুলি যেন বললে! অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে মন কত কথা কয়!

জানলার ধারে কি যেন একটা শব্দ হল!

অদ্ভুত ধরনের শব্দটা। কে যেন জানলার গরাদের ওপর ঠোকা দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইচে!···একবার···দুবার, তিনবার···ভয়ে আমার বুকের মধ্যে টিপ্‌টিপ্ করতে লাগলো···কাউকে ডাকবো চীৎকার করে? ···একবার চেয়ে দেখবো জানলার দিকে জিনিসটা কি? হঠাৎ আমার মনে পড়লো একটা ধাড়ি বেঁজী অনেকদিন থেকে বাইরের দেওয়ালে, কড়িকাঠের খোলে বাসা বেঁধে আছে···আজ বিকেলেও সেটাকে একবার দেখেচি। জানলার ওপরকার কাঠে সেটা পোকামাকড় বা জোনাকি ধরছে···এ তারই শব্দ।

কথাটা মনে হতেই মনের মধ্যে সাহস আবার ফিরে এল। ···উঃ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল যেন!···শরীর অসুস্থ থাকলে কত সামান্য কারণ থেকে ভয় পায় মানুষ! পাশ ফিরে এবার ঘুমুবার চেষ্টা করলুম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু আমার এ ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। এ-ধারণা আমার মন থেকে কিছুতেই গেল না যে, আজ রাত্রে আমি একা নই—আরও কে এখানেই আছে! নিদ্রাহীন চোখে সে আমার ওপর খরদৃষ্টি দিয়ে পাহারা রেখেচে—আমায় সে নিরাপদে বিশ্রাম করতে দেবে না আজ।···

বার বার ঘুম আসে, আবার তন্দ্রা ছুটে যায়, অমনি জেগে উঠি; কিন্তু চোখ চাইতে, বা বিছানার ওপর উঠে বসতে সাহস হয় না···আর সেই শব্দটা মাঝে মাঝে জানলার গরাদের ওপর হতে শুনি—খুব মৃদু করাঘাতের শব্দ যেন!···যেন শব্দটা বলচে—"চেয়ে দেখ···পেছন

ফিরে জানলার দিকে চেয়ে দেখ…”

ঘামে দেখি বিছানা ভেসে গিয়েচে, ভাদ্রের গুমট গরম কিনা! এই অবস্থায় ভোর হল। দিনের আলো ফুটলে, লোকজনের শব্দ কানে যেতে রাত্রের ভয়টা মন থেকে কোথায় গেল মিলিয়ে! নিশ্চিন্ত মনে বেলা ন'টা পর্যন্ত পড়ে ঘুম দিলুম। তার পর উঠে, চা খেয়ে, পাড়ায় বেড়াতে বার হওয়া গেল।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটলো—তখন আমি তার বিশেষ কোন মূল্য দিই নি—কিন্তু পরে সব কথা মনে মনে আলোচনা করে দেখে সেটা ভারি আশ্চর্য বলেই মনে হয়েছিল। ও-পাড়ার পথে আমার সেই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা, তাঁকে দেখাবার জন্যে আমি মেডেলটা কাল রাত্রে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলুম—কিন্তু বৃন্দাবনদের বাড়িতে নিমন্ত্রণের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি…

আমায় দেখে তিনি বললেন, “এই যে সুরেন, ভালো আছ? কাল তুমি এসেচ দেখলুম, তখন অনেক রাত, তা আর ডাকলুম না। বোধ হয় বৃন্দাবনের বাড়ি থেকে ফিরছিলে? আমি তখন ছাদে পায়চারি করচি, যে গরম গিয়েচে বাবা কাল রাত্তিরে… তোমার সঙ্গে লোক রয়েচে দেখে আরও ডাকলুম না। ও লোকটি কে? খুব লম্বা বটে—যেন শিখ কি পাঞ্জাবীর মতো লম্বা—তোমার বন্ধু বুঝি? বাঙালীর মধ্যে এমন চেহারা—বেশ, বেশ!”

আমি অবাক হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললুম, “আমার সঙ্গে লম্বা লোক কাল রাত্তিরে! সে কি জ্যাঠামশায়?”

জ্যাঠামশায় আমার চেয়েও অবাক হয়ে বললেন, “তোমার সঙ্গে লোক ছিল না বলচো? একা যাচ্ছিলে? আমার চোখের দৃষ্টি একেবারে কি এত খারাপ হয়ে যাবে বাবা…”

আমি হেসে বললুম, “তাই হবে, জ্যাঠামশায়। চোখে কি রকম ঝাপসা দেখে থাকবেন। বয়েস হয়েচে তো?…আমার সঙ্গে কেউ ছিল না, তা ছাড়া আপনাদের বাড়ির সামনের আমগাছটার ছায়া…কি রকম আলো-আঁধার দেখেচেন চোখে…অমন ভুল হয়।”

জ্যাঠামশায় যেন রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলেন! বললেন, কি আশ্চর্য কাণ্ড? এতটা ভুল হবে চোখে? আমগাছের এদিকে যখন তুমি টর্চ জ্বাললে, তখন দেখলুম তুমি আর **তোমার পেছনে একজন লম্বা** মতো লোক…তার পর তুমি টর্চ নিবিয়ে আমগাছের ছায়ার মধ্যে ঢুকলে, তখনও জ্যোৎস্নার আলো আর আমগাছের ছায়ার অন্ধকারে আমি বেশ দেখতে পেলুম লোকটি তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছে…তোমার মাথার চেয়েও যেন এক হাত লম্বা…তোমার একেবারে ঠিক পেছনে…তবে খুব ভালো তো দেখতে পেলুম না…অতদূর থেকে আর আলো-অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না তো? এমন কি একবার এ পর্যন্ত মনে হল তোমায় ডেকে জিজ্ঞেস করি তোমার বন্ধুটি কে?…একেবারে এত ভুল হবে চোখের?”

জ্যাঠামশায়কে পুনরায় বুঝিয়ে বললুম, আমার সঙ্গে কাল কেউ ছিল না। আমি একাই ছিলুম, সুতরাং তাঁর দৃষ্টিশক্তির গোলমাল ছাড়া এ-ব্যাপারের অন্য কোনও সিদ্ধান্ত করা চলে না।

সারাদিন বৃন্দাবনের সঙ্গে আড্ডা গিয়ে কাটানো গেল। গতকাল রাত্রের ভয়ের ব্যাপার দিনের আলোয় এত হাস্যকর বলে আমার নিজের কাছেই মনে হল যে, বৃন্দাবনকে সে কথাটা বলিও নি।

রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় ফিরবো। বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে চা খেয়ে বাড়ি এসে সুটকেসটা নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়েচি, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ নেমেচে। বাউরিপাড়ার বড় বাগানটার মধ্যে দিয়ে আসচি···বাগানটা পার হতে প্রায় পাঁচ-ছ মিনিট লাগে—মস্ত বড় বাগান।

বাগানের ঠিক মাঝামাঝি এসে হঠাৎ পেছন ফিরে চাইলুম কি ভেবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আচমকা ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঠ হয়ে গেল।

কে ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে।

রাস্তা থেকে একটু পাশে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে আধ-অন্ধকার এক অদ্ভুত মূর্তি! খুব লম্বা, তার মাথায় ঘোড়ার বালামচির সেই এক লম্বা ধরনের টুপি, পাতলা লোহার চেন দিয়ে থুতনির সঙ্গে বাঁধা—ছবিতে গোরা সৈনিকদের মাথায় যে ধরনের টুপি দেখা যায়?···মূর্তিটা যেন নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থায় আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে! আমার কাছ থেকে মাত্র দশ গজ কি তারও কম দূরে! মরীয়ার মতো আর একটু এগিয়ে গেলুম। এই ভয়ানক কৌতূহল আমাকে চরিতার্থ করতেই হবে যেন! মূর্তি নড়ে না চড়ে না,—যেন নিশ্চল পাথরের মূর্তি! কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখচি সাত আট গজ মাত্র দূরে তখন মূর্তিটা। আর ঘোড়ার বালামচির লম্বা টুপি ও ইস্পাতের চেনের স্ট্র্যাপ্ স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

আমার পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো, সারা দেহ কেমন অবশ হয়ে আসচে, মাথাটা হঠাৎ বড় হালকা হয়ে গিয়েচে! বোধ হয় আর আধ মিনিট এ-ভাবে থাকলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতুম—কারণ সেই ভীষণ মূর্তিটার মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে—আমার পা দুটো বেজায় ভারী হয়েচে—নড়বার উপায় নেই মূর্তির সামনে থেকে···

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাউরিবাগানের পথে লণ্ঠন নিয়ে কারা ঢুকলো। দু-তিন জন লোকের গলার শব্দ শুনে আমার সাহস ফিরে এল। আমি ওদের ডাক দিলুম চিৎকার করে। ওরা ছুটে এল। আমায় ওখানে বনের মধ্যে দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বললে, "ওখানে কি বাবু? কি হয়েচে?"

তারপর লণ্ঠন তুলে ওরা আমার মুখ দেখে বললে, "ও আপনি? কি হয়েছে আপনার? মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েচে—ভয়টয় পেলেন নাকি? বাউরিবাগান জায়গাটা ভালো না। সন্ধ্যের পর এখানে অনেকে ভয় পায়।"

ওদের লণ্ঠনটা যখন উঁচু করে তুলে ধরলে আমার মুখে, সেই আলোয় দেখলুম—সামনের মূর্তিটা তখনও সেখানে ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে! একজন বললে, "কি দেখছিলেন এখানে দাঁড়িয়ে বাবু—এই ষাঁড়াগাছটা?"

আর একজন বললে, "গাছটার ডালপালা কেটে মাথায় ঝোপের মতো করে রেখেচে, যেন মানুষ বলে অন্ধকারে ভুল হয় বটে···চলে আসুন বাবু!"

আমিও দেখলুম ষাঁড়াগাছই বটে। মাথার দিকের পাতাগুলো ছেঁটে গাছটাকে দেখতে হয়েচে ঠিক হর্স্‌গার্ডস্‌দের ঘোড়ার বালামচির টুপি! লোকের চোখের কি ভুলই হয়? কাল আমি আবার জ্যাঠামশায়কে চশমা নিতে বলছিলুম! ভেবে লজ্জা হল মনে মনে। তিনি বৃদ্ধ লোক, তাঁর চোখের ভুল তো হতেই পারে—আমারই যখন এই অবস্থা!

ওরা আমায় আলো ধরে স্টেশনে পৌঁছে দিলে।

পরের দিন স্কুলে সুধীরের মেডেলটা ফেরত দিলুম।

সুধীর বললে, "আপনাকে দাদু একবার ডেকেচেন, আমার সঙ্গে ছুটির পর আমাদের বাড়ি আসুন। নিয়ে যেতে বলেচেন।"

সুধীরের দাদু বললেন, "যাক, আমার বড় ভয় হয়েছিল, মাস্টারবাবু! সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটা নিয়ে গিয়েছেন দেশে শুনলুম কিনা? আপনার দেশের ঠিকানা জানতুম না—তাহলে একটা তার করে দিতুম।···ও মেডেলটা আমার বাবাকে একজন গোরা সৈন্য দিয়ে যায়—আমি তখন জন্মাই নি। বাঁধা দিয়েছিল আর উদ্ধার করতে পারে নি। বেজায় মাতাল আর গোঁয়ার ছিল লোকটা। ও মেডেলের বিপদ হচ্ছে—আমাদের বংশের লোক ছাড়া অন্য কেউ নিলে তার বড় বিপদ ঘটে। আমার এক ভগ্নীপতি একবার কিছুতেই শুনলে না—অনেক কাল আগের কথা—বাড়ি নিয়ে গেল মেডেল দেখাতে; সেই দিনই সন্ধ্যের সময় ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল। মৃতদেহের পকেট থেকে মেডেলটা বেরুলো।···"

আমি কলের পুতুলের মতো শুধু বললুম, "ছাদ থেকে?···পকেটে মেডেল পাওয়া গেল?···"

"হ্যাঁ, মাস্টারবাবু। আমার নিজের ভগ্নীপতি, মিথ্যে কথা তো বলবে না। আজ সাতাশ-আটাশ বছর আগের কথা। ···ওটা আরও দু-একজন নিয়েচে—তক্ষুনি ফেরত দিয়ে গিয়েচে। বলে রাত্রে ভয় পায়, গা ছমছম করে। কে যেন পেছনে ফলো করচে বলে মনে হয়! ও বাইরের লোকের সহ্য হয় না। প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়।···তাই ভাবছিলুম একটা তার করে দেবো···'

একটা কথা বলা দরকার। মাসখানেক পরে আমি আবার দেশে যাই। বাউরিবাগানে ঢুকে যেখানে সে-রাত্রে ভয় পেয়েছিলুম, সেদিকে চেয়ে দেখে সে ষাঁড়াগাছটা কোথাও আমার চোখে পড়লো না। যে আমগাছটার ধারে ষাঁড়াগাছটা দেখেছিলুম সেখানে দিনমানে বেশ ভালো করে দেখেছি—কোথাও সে ষাঁড়াগাছটা নেই—বা গাছ কেটে নিলে সে গুঁড়িটা থাকবে, তারও কোন চিহ্ন নেই। কস্মিনকালে সেখানে একটা বড় ষাঁড়াগাছ ছিল বলে মনেও হয় না জায়গাটা দেখে।···

মসলাভূত

বড়বাজারের মসলাপোস্তায় দুপুরের বাজার সবে আরম্ভ হয়েচে। হাজারি বিশ্বাস প্রকাণ্ড ভুঁড়িটি নিয়ে দিব্যি আরামে তার মসলার দোকানে বসে আছে। বাজার একটু মন্দা। অনেক দোকানেই বেচা-কেনা একেবারে নেই বললেই চলে, তবে বিদেশী খদ্দেরের ভিড় একটু বেশি। হাজারির দোকানে লোকজন অপেক্ষাকৃত কম। ডানহাতে তালপাতার পাখার বাতাস টানতে টানতে হাজারি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ কার পরিচিত গলার স্বর শুনে সে চমকে উঠলো।

—"বলি ও বিশ্বেস,—বিশ্বেস মশাই!"—বার দুই হাঁক ছেড়ে যতীন ভদ্র তার ডান হাতের লাঠিটি একটা কোণে রেখে দিয়ে সম্মুখের খালি টুলটার উপর ধপাস্ করে বসলো।

যতীন হাজারি বিশ্বাসের সমবয়স্ক—অনেক দিনের বন্ধু। ভাগ্যলক্ষ্মী এতকাল তার ওপর অপ্রসন্ন ছিল। হালে সে হাজারির পরামর্শে মসলার বাজারে দালালী আরম্ভ করেছে। দু'পয়সা পাচ্ছেও সে। যতীনের মোটা গলার কড়া আওয়াজ পেয়ে হাজারি খুব আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে

বসলো। হাজারি বিলক্ষণ জানতো যে, যতীন যখনই আসে কোন একটা দাঁও বিষয়ে পাকাপাকি খবর না নিয়ে সে আসে না। তাই সে যতীনকে খুবই খাতির করে।

যতীন বললে, "দেখ, শুধু দোকানদার হয়ে খদ্দেরের আশায় রাস্তার দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকলে তাতে আর টাকা আসে না—ঘুমই আসে। পাঁচটা খবরাখবর রাখতে হয়, বুঝলে?"

হাজারি বললে, "এসো এসো, যতীন। ভালো আছ? অনেক দিন দেখি নি। কিছু খবর আছে নাকি?"

"সেই খবর দিতেই তো আসা। এ-বাজারে শুধু গণেশের পায়ে মাথা ঠুকলেই টাকা করা যায় না—। অনেক হদিস জানতে হয়—অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে টাকা, বুঝলে? ···এখন কি দেবে বলো। জানই তো যতীন ভদ্র বকে একটু বেশি, কিন্তু খবর যা আনে তা একদম পাকা। যাক, এখন আসল কথা তোমায় যা বলি বেশ মন দিয়ে শোন···"

যতীন অতঃপর হাজারিকে কাছে বসিয়ে চুপি চুপি তার কথাটি বলে গেল। যতীনের কথায় টাকার গন্ধ পেয়ে হাজারি কান খাড়া করে এমনি একাগ্রভাবে শুনে যেতে লাগলো, যে সত্যনারায়ণের পাঁচালীও লোকে অতটা মন দিয়ে শোনে না।

ব্যাপারটি এই।—

গ্রেহাম ট্রেডিং কোম্পানির একটা মস্ত মালজাহাজ এস. এস. রেঙ্গুন, ডাচ্ ইস্ট্ ইন্ডিজের কোন এক বন্দর থেকে প্রচুর মাল নিয়ে কলকাতায় আসছিলো। যতরকম মাল বোঝাই ছিল, তার মধ্যে মসলার বস্তাই সব চেয়ে বেশি। লঙ্কা, হলুদ, জিরে, তেজপাতা প্রভৃতি কত রকমের মসলা। প্রতি বস্তাটি ওজনে আড়াই মণের কম নয়। এরকম শত শত বস্তার গাদায় জাহাজখানা আগাগোড়া ঠাসা। সেই মালজাহাজখানি গঙ্গার ভেতরে ঢুকতেই ঘন কুয়াশার মধ্যে শেষ রাত্রির ভাঁটার মুখে গঙ্গার চোরাবালির চড়ায় ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। জাহাজ যখন সবে ডায়মন্ডহারবার পেরিয়ে গঙ্গায় এসেচে—তখন এই ব্যাপার। সারেঙ শত চেষ্টা করেও কিছুতে সামাল দিতে পারলে না। জাহাজডুবির সঙ্গে কতক লোকেও জলে ডুবে মারা যায়। জাহাজের কতক মাল নষ্ট হয়ে যায় আর বাদবাকি মাল সব গঙ্গার জলে ভাসতে থাকে। মসলার বস্তাগুলো প্রায়ই ডোবে নি—বিশেষ ক্ষতিও হয় নি। দূর থেকে ওই মসলাবস্তার গাদাগুলো ভেসে যেতে দেখে পোর্টকমিশনারের লোকেরা সে সব তুলে পারে টেনে নেয়। কাল সাড়ে আটটার সময় নিলাম ডেকে সেই বস্তাবন্দী মসলাগুলো বিক্রি করা হবে।

ধড়িবাজ হাজারি বিশ্বাস যতীনের কথাবার্তা শুনে চট করে সব বুঝে নিলে। কত লোককে চরিয়ে কত পাকা ধানে মই দিয়ে তবে সে আজ এত টাকার মালিক। কথাবার্তা তখনই সব ঠিক হয়ে গেল। যাবার সময় যতীন আবার হাজারিকে বেশ করে মনে করিয়ে দিয়ে বললে, "দেখো ভায়া! টাকা যদি পিটতে চাও তবে এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া নয়। জলের দামে মাল বিকিয়ে যাচ্ছে। কাল সকাল সাড়ে আটটায় নিলেম। আমি সাতটার সময়েই এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো।"

পরদিন হাজারি যতীনকে নিয়ে যথাসময়ে খিদিরপুরের দিকে রওনা হয়ে গেল। নিলামের জায়গায় পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই, দূর থেকে কলরব শোনা যাচ্ছে। যতীন আগে আগে চলেচে—হাজারি পেছনে পেছনে ছুটচে। এতবড় সস্তার কিস্তিটা ফস্‌কে না যায়। হাজারি যতীনকে বরাবর নিলামের কাছে বস্তাগুলো গুনতি করতে পাঠিয়ে দিয়েই নিজে সটান এক দৌড়ে সাহেবের কাছে গিয়ে মস্ত বড় এক সেলাম করলে। সাহেবের সঙ্গে দু-মিনিট

ফিসফাস করে কি কথাবার্তা বলে হাজারি ঊর্ধশ্বাসে ছুটে এসে নিলামের ডাক বন্ধ করে দিলে।

যতীন বললে, "কি খবর ভায়া—সুবিধে করতে পেরেছ তো?"

হাজারি খুব ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললে, "পরে বলবো। কাজ হাসিল। এখন কত বস্তা গুনলে বলো দেখি?"

"একশো বস্তা গোনা হয়ে গেছে।"

বাস্তবিক, উঁচু উঁচু গাদা-করা মসলার বস্তাগুলোর দিকে চেয়ে হাজারির চোখ জুড়িয়ে গেল। সে যে দিকেই তাকায়, দেখে যে অগুনতি বস্তা সারবন্দী থামের মতো রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঃ, এমন দাঁও জীবনে কারও ভাগ্যে একবার বই দুবার আসে না! এখন মসলাপোস্তায় কোনরকমে তার গুদামে এগুলো চালান দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

"আর দেরি নয়"—হাজারি যতীনকে তাড়া দিয়ে ডেকে বললে, "ওহে ভায়া, শুভ কাজে আর বিলম্ব কেন? এখন লরী ডেকে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই করে পোস্তায় চালান দিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ এগিয়ে যাই।"

একেবারে সব মাল লরীতে ধরলো না। দ্বিতীয় ক্ষেপ বস্তা চাপিয়ে যতীন যখন পোস্তায় ফিরে গেল তখনও বিকেল আছে। সে এসে দেখে, সবই অব্যবস্থা। রাশীকৃত বস্তার গাদা হাজারির দোকানের সামনে ফুটপাতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মাত্র তিনটি লোক এতগুলো মাল তোলবার জন্যে লাগানো হয়েচে। চতুর্দিকে লোকের মহাভিড়—হৈ হৈ ব্যাপার! এদিকে পুলিশ তাড়া দিচ্ছে—"জলদি মাল হঠাও!" হাজারি কেবল চেঁচাচ্ছে। সে যেন কিছুই গোছগাছ করে উঠতে পাচ্ছে না।

কাণ্ডকারখানা দেখে যতীন নিজেই কোমর বেঁধে লেগে গেল। প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার পূর্বেই সব মাল তোলা হয়ে গেল। বস্তাগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে দেখা গেল ঘরে আর কুলোয় না। তখন বস্তার ওপর বস্তা চাপিয়ে দিয়ে কড়িকাঠ পর্যন্ত মাল ঠাসা হল। গম্বুজের মতো এক একটা ফুলো ফুলো বস্তা, আর বস্তুগুলো উঁচুও কি কম? এই ভাবে বস্তা ভরাট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, যতীন আর হাজারি যখন বাড়ি ফিরলো তখন রাত দশটা। সে রাত্রি গুদামে তালা লাগিয়ে দিয়ে প্রতিদিনের মতো হাজারির চাকর বাইরে শুয়ে রইলো।

শেষ রাত্রে মসলার গুদামে কি একটা শব্দ শুনতে পেয়ে আশে-পাশে দোকানদারদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা চোরের আশঙ্কা করে চাকরটাকে ডেকে তুললে। চাকরটা শশব্যস্ত হয়ে আলো জ্বেলে বেশ পরখ করে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। কিন্তু চোর ঘরে ঢুকলো কি করে? গুদোমের দরজার তালা বন্ধ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদে আবার দুম্ দুম্ শব্দ! সকলে কান খাড়া করে রইলো। বেশ মনে হল এবারকার শব্দটা যেন হাজারির মসলার গুদোমের ভেতর থেকেই আসচে। অথচ ঘরের দোর-জানলা বন্ধ, বাইরে থেকে মোটা তালা দেওয়া। কি আশ্চর্য, চোর ভেতরে যাবেই বা কি করে? আর চোর-টোর যদি না এল তবে শব্দও বা করে কে? মাঝে মাঝে মনে হতে লাগলো, ঘরের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসবার জন্যে কারা যেন ভেতর দরজায় ধাক্কা মারচে। শেষ রাতের বাকি সময়টা এইভাবেই শব্দ শুনে কেটে গেল। আরও আশ্চর্য, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই গুদোমঘর থেকে শব্দও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। সে রাত্রি এই পর্যন্ত।

পরদিন সকালে মসলাপট্টির দোকানদারদের মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে হাজারির দোকানে বিষম কাণ্ড, ভীষণ চুরি! আসলে সত্যি যা নয় তার দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মিথ্যে

রটাতে লাগলো। ক্রমে কথাটা হাজারির কানে উঠলো। হাজারি বিশ্বাস খবর পাওয়া মাত্র দৌড়ে এসে তালা খুলে গুদোমে ঢুকে দেখে যে, বস্তাগুলো ঠিকই আছে, একটি মালও বেহাত হয়নি। কি ব্যাপার? তখন সে ভাবলে কিছু নয়; তার মসলা-বস্তাগুলো দেখে যাদের চোখ টাটিয়ে ছিল—এ নিশ্চয়ই সেই বদমাশদের মিথ্যে কারসাজি; তারাই মজা দেখবার জন্যে চুরির গুজব রটিয়েচে, কিন্তু হরে চাকরটাও যে বললে, ভীষণ শব্দ শোনা যাচ্ছিল? এই শব্দ-রহস্যটা হাজারি কিছুতেই কিনারা করতে পারলে না। চোর যদি এসেই থাকবে, তবে কিছু নিলেও না, উপরন্তু শব্দ করে জানান দিয়ে চলে গেল—এ কি ব্যাপার? তবে কি তাকে ভয় দেখাবার জন্যেই রাত্রিবেলা দুর্বৃত্তেরা এইসব আয়োজন করেচে? সাতপাঁচ ভেবে হাজারি সেদিনকার মতো কথাটা চেপে গেল, ভাবলে আজ রাতে আর বাড়ি না গিয়ে নিজেই দোকান পাহারা দেবে! করলেও তাই।

রাত্রে ঘুমোবার আগে হাজারি বেশ করে চাকরটাকে নিয়ে গুদোমের উপর থেকে আরম্ভ করে নিচে পর্যন্ত পাতিপাতি প্রত্যেকটি বস্তার গাদা দেখতে লাগলো। তারপর ভেতরে থেকে জানলাটা খুলে রেখে ঘরে তালা লাগিয়ে দিল। তবে, আজ একটু নয়—হবসের চার লিভারের দুটো মস্ত ভারী তালা। হাজারি চাকরটাকে নিয়ে ঘরের সামনে শুয়ে নানা কথাবার্তার পর যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন রাত দুপুর।

শেষ রাত্রের দিকে কি একটা শব্দ হতেই হাজারির ঘুম ভেঙে গেল। হরে চাকরটা আগেই একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। গত রাত্রের ব্যাপারও তার বেশ মনে আছে। তাই সে নিজে আর কোন কথা না বলে চুপ করেই পড়ে ছিল। কিন্তু খানিক বাদেই ও আবার কিসের শব্দ?···ধপাস্—ধুপ্—দুম্—দুম্—দাম্! ঘরের ভেতরে বস্তায় বস্তায় কি বিষম ধস্তাধস্তি! যেন দৈত্য দানবে লড়াই বেধেচে। হরে আর হাজারি তখন ধড়মড় করে এক লাফে বিছানা ছেড়ে আলো জ্বালিয়ে দেখতে লাগলো তালা ঠিক আছে কিনা। তালা দুটা ঠিকই আছে। হাজারি জানলার ফাঁকে চোখ তাকিয়ে দেখতে পেলে—দুটো প্রকাণ্ড বস্তা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় ঢুঁ মারচে। ভয়ে হাজারির চোখ দুটো ডাগর হয়ে উঠলো। বস্তা জীবন্ত হয়ে উঠলো নাকি? না, সে চোখে ভুল দেখছে? না, অনিদ্রায় আর দুর্ভাবনায় তার মাথার ঠিক নেই? হাজারি ভয়ে ভয়ে খানিকটা চোখ বুজে রইলো।

হাজারি চোখ যখন খুললে তখন ভোরের আলো জানলার গরাদ দিয়ে ঘরে স্পষ্ট দেখা দিয়েচে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-টব্দও সব থেমে গিয়েচে। হরে অমনি বলে উঠলো, "বাবু সেদিনও দেখেচি—ভোর হতেই শব্দ থেমে যায়।" হাজারি আর দ্বিরুক্তি না করে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখলে কোথাও কিছু নেই। মালপত্র ঠিকই আছে, তবে কালকের থেকে আজ তফাত এই যে বস্তাগুলো যেটি যে জায়গায় দাঁড় করানো ছিল, সেটি ঠিক সেখানে নেই। প্রত্যেক বস্তাটিই যেন সরে সরে তফাত হয়ে গেছে। একটা বস্তা আর একটার ঘাড়ে কাত হয়ে পড়েচে। বিশেষ করে পেছন দিকের কতগুলো বস্তা হাণ্ডুল-বাণ্ডুল অবস্থায় পড়ে রয়েচে!—হাজারি মহা ভাবনায় পড়ে গেল। চোরই যদি হয় তবে শব্দের সৃষ্টিপাত কেন? আর চোর ঢোকেই বা কোথা থেকে? আর বেরিয়েই বা যায় কেমন করে? অসম্ভব! তবে কি জাহাজডুবি লোকগুলো ডুবে মরে ভূত হয়ে মসলাবস্তায় যে যার ঢুকে বসে আছে?

লাটের মাল কিনে অবধি দু'রাত্রি তো এই ভাবে কাটলো। আজ তৃতীয় রাত্রি। হাজারির রোখ অসম্ভব বেড়ে গেছে! আজ সে মরীয়া হয়ে দুজন লোক নিয়ে সারা রাত্রি গুদামের বাইরে জেগে বসে রইলো। হাতের কাছে যাকেই সে পাবে, কিছুতেই আজ আর তাকে আস্ত

রাখবে না। তার এই অভীষ্টসিদ্ধি করার জন্যে দিনমানেই সে খুব ঘুমিয়ে নিয়েচে—পাছে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। টং টং টং টং—পাশের ঘরের ঘড়িতে চারটে বেজে গেল। হাজারির চোখের পাতা পড়ে না। সে ঠায় জেগে আছে। কোথাও কিছু নেই, কিন্তু হঠাৎ এ কি কাণ্ড? শত শত লোক একত্র খুব দম দিয়ে নিশ্বাস টেনে ছেড়ে দিলে যেমন একটা ঝড়ের মতো সাঁই সাঁই করে শব্দ হয়—অবিকল তেমনি একটা শব্দ শোনা গেল।

হাজারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েই এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলো! দরজার দোরগোড়ায় যে দুটো লোক শুয়েছিল হাজারি চট্ করে তাদের জাগিয়ে দিয়ে বললে, "তোরা শীগ্‌গির ঘরের পেছনটায় দৌড়ে গিয়ে দেখ দেখি—চোরেরা সেখানে কোন সিঁধ কেটেচে নাকি।" তারপর হাজারি গুদোমের তালা খুলে ফেললে।

কিসের সিঁধ, আর কোথায় বা চোর! বস্তাগুলো যে সব হাই ছেড়ে সারবন্দী দাঁড়াতে লাগলো! হরে চাকরটা ভয়ের সুরে বললে, "বাবু এদিকে চেয়ে দেখুন!" হাজারি দুই চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে বললে, "অ্যাঁ, বলে কি? আমার মসলার বস্তারা নাচচে?" চাকর দুজন এ দৃশ্য দেখেই ভয়ে দে চম্পট।

তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড!

বস্তাগুলো সব একটির পর একটি ঠক্‌ঠক্ করে ঠিকরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। সৈন্ধব লবণের প্রকাণ্ড জাঁদরেল গোছের বস্তাটা তো সর্বাগ্রে বেরিয়ে পড়েই সটান গঙ্গার দিকে দে ছুট। অন্য বস্তাগুলো সব সারি দিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ধিনিক্ ধিনিক্ করে খানিকটা নেচে নিয়ে তারপর সমানে লাফিয়ে মার্চ করে স্ট্যান্ড রোড ট্রামের রাস্তা ছাড়িয়ে চলতে লাগলো। নিলামে কেনা বস্তাগুলো দলের অগ্রণী হয়ে চলেচে, পেছনে পেছনে চলেচে সারবন্দী গুমোদের অন্য অন্য বস্তা। এই ভাবে হাজারির মসলার গুদোম উজাড় হয়ে গেল!

শেষ রাত্রি। আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ! গঙ্গার জলে মেটে জ্যোৎস্না। হাজারি বিশ্বাস একা দাঁড়িয়ে। একি সত্যি, না স্বপ্ন! নির্বাক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে সে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখচে। লোক ডেকে চেঁচিয়ে উঠবে সে শক্তিও তার লুপ্ত। সারবন্দী মসলার বস্তাগুলো গঙ্গার ধারে পৌঁছলো এবং গঙ্গার উঁচু বাঁধানো পোস্তার ওপর থেকে ধপাস্ ধপাস্ করে নিচে গঙ্গার জলে দিলে ডুব। এইভাবে পরপর সমস্ত বস্তা একে একে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। এবারেও আগে ডুবলো নিলামের বস্তাগুলো—তারপর গুদোমের অন্য অন্য বস্তা।

এক রাত্রির মধ্যে হাজারি বিলক্ষণ নিঃস্ব হয়ে গেল।

এই ঘটনা শোনার পর হাজারির প্রতিবেশী দোকানদারেরা সকলেই বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে এক বাক্যে বললে, "হুঁ, হুঁ, আমরা অনেক আগেই জানতুম। ভরা অমাবস্যায় জাহাজডুবি। আর সেই লাটের মাল কিনলে কিপটে হাজারি বিশ্বাস! ভাগ্যিস, বুদ্ধি করে আমরা ঘেঁষি নি। এ মাল কিনলে আমাদের কি রক্ষা থাকতো!"

বামা

আমার যখন বাইশ চব্বিশ বছর বয়েস তখন নানা দেশ বেড়ানোর একটা কাজ জুটে গেল আমার অদৃষ্টে। তখন আমি দৈব ঔষধের মাদুলি বিক্রি করে বেড়াতুম। চুঁচড়োর শচীশ কবিরাজের তরফ থেকে মাইনে ও রাহাখরচ পেতুম। অল্প বয়সের প্রথম চাকরি, খুব

উৎসাহের সঙ্গেই করতুম।

আমাকে কাপড়চোপড় পরতে হত সাধু ও সাত্ত্বিক বামুনের মতো। ওটা ছিল ব্যবসায়ের অঙ্গ। গিরিমাটির রঙে ছোপানোর কাপড় পরনে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গলায় মালা, হাতে থাকতো একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, তারই মধ্যে মাদুলি ও অন্যান্য ওষুধ থাকতো।

বছর তিনেক সেই চাকরি করি, তারপর শরীরে সইলো না বলে ছেড়ে দিলুম।

একবার যাচ্ছি বর্ধমান জেলার মেমারি স্টেশন থেকে মাখমপুর বলে একটা গ্রামে। এটা মাদুলি বিক্রির জন্যে নয়; মাখমপুরে শচীশ কবিরাজের শ্বশুরের বাড়ি। সেখানকার জমিজমার ওয়ারিশান দাঁড়িয়েছিলেন শচীশবাবু—শ্বশুরের ছেলেপুলে না থাকায়। আমাকে পাঠিয়েছিলেন পৌষ-কিস্তির সময় জমিজমার খাজনা যতটা পারি আদায় করে আনতে।

কিন্তু তাহলেও পরনে আমার গেরুয়া কাপড়, হাতে মাদুলি ও ওষুধভরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ইত্যাদি সবই ছিল, যদি পথেঘাটে কিছু বিক্রি হয়ে যায়, কমিশনটা তো আমি পাব!

কখনও ও অঞ্চলে যাইনি। মেমারি স্টেশনে নেমে বেলা দুটোর সময়ে হাঁটচি তো হেঁটেই চলেচি, পথ আর ফুরোয় না। এক জায়গায় একটা ছোট বাজার পড়লো, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার পথ হাঁটি।

গ্রামে গ্রামে ওষুধ বিক্রি করে বেশ কিছু রোজগারও করা গেল, দেরিও হল বিশেষ করে সেই জন্যে। আর একটা বাজার পড়লো। সেখানে দোকানদারদের কাছে শুনলুম, আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে অন্তত রাত নটা বাজবে। কিন্তু সকলেই বললে, "সন্ধ্যের পরে আগে গিয়ে আর পথ হাঁটবেন না, ঠাকুরমশায়। এই সব দেশে ফাঁসুড়ে ডাকাতের বড় ভয়, বিদেশী দেখলে মেরেধরে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়। প্রায়ই বনের ধারে বড় বড় মাঠের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সাবধান, একটা দীঘি পড়বে মাঠের মধ্যে ক্রোশ তিনেক দূরে, জায়গাটা ভালো নয়…"

বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা। সন্ধ্যা প্রায় হয়-হয়, এমন সময় দূরে একটা তালগাছ ঘেরা দীঘি দেখা গেল বটে। আমার বুক ঢিপঢিপ করে উঠলো। দীঘির ও-পাশে সঞ্জয়পুর বলে একটা গ্রাম, সেখানেই রাত্রের জন্যে আশ্রয় নেওয়ার কথা বাজারে বলে দিয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যা তো হয়ে গেল তালদীঘির এদিকেই—অন্ধকার হবার দেরি নেই, কোথায় বা সঞ্জয়পুর, কোথায় বা কি?

মনে ভারি ভয় হল। কি করি এখন? সঙ্গে মাদুলি ও ওষুধ বিক্রির দরুন অনেক টাকা। পরক্ষণেই ভাবলাম, কিছু না পারি দৌড়তে তো পারব? না-হয় ব্যাগটাই যাবে,—প্রাণ তো বাঁচবে।

ভয়ে ভয়ে দীঘির কাছাকাছি তো এলুম। …বড় সেকেলে দীঘি, খুব উঁচু পাড়, পাড়ের দু-ধারে বড় বড় তালগাছের সারি। তার ধার দিয়েই রাস্তা। দীঘির পাড়ে কিন্তু লোকজনের সম্পর্ক নেই। যে ভয় করেছিলুম, দেখলুম সবই ভুয়ো। মানুষ মিথ্যে যে কেন এ-রকম ভয় দেখায়!

প্রকাণ্ড দীঘিটার পাড় ঘুরে যেমন তালবনের সারি ও দীঘির উঁচু পাড়কে পেছনে ফেলেচি, সামনেই দেখি ফাঁকা মাঠের মধ্যে দূরে একটা গ্রাম লি-লি করছে—নিশ্চয় ওটা সেই সঞ্জয়পুর। …বাঁচা গেল বাবা! কি ভয়টাই দেখিয়েছিল লোকে! দিব্যি ফাঁকা মাঠ, কাছেই লোকের বসতি, গাঁয়ের গরু বাছুর চরছে মাঠে—কেন এ-সব জায়গায় বিপদ থাকবে?

আমি এই রকম ভাবচি, এমন সময় তালপুকুরের ওদিকের পাড়ের আড়ালে যে পথটা,

সেই পথ বেয়ে একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলুম। বৃদ্ধ বেশ বলিষ্ঠ গড়নের, এই বয়সেও মাংসপেশী বেশ সবল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ছোট একটা লাঠি।

বৃদ্ধ আমায় বললে, "ঠাকুরমশায় কোথায় যাবেন?"

"যাব মাখমপুর···"

"মাখমপুর! সে যে এখনও তিন ক্রোশ পথ···কাদের বাড়ি যাবেন?"

"শচীশ কবিরাজের বাড়ি।"

"ঠাকুরমশায় কি কবিরাজমশায়ের গোমস্তা?"

"গোমস্তা নই, তবে যাচ্ছি জমিজমার কাজে বটে।"

"এ অঞ্চলে আর কাউকে চেনেন? ···মশাইয়ের নিজের বাড়ি কোথায়?"

"আমি এদিকে কখনও আসিনি, কাউকে চিনিও নে। মাখমপুরেও নতুন যাচ্ছি···"

"সেখানেও কেউ তাহলে আপনাকে চেনে না।"

"নাঃ, কে চিনবে?"

আমার এই কথায় আমার যেন মনে হল বুড়ো একটু কি ভাবলে, তারপর আমায় বললে, "কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি···রাত্রে আজ দয়া করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন। আমরা জাতে বারুই, জল-আচরণীয়, আপনার অসুবিধে হবে না। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বাইরের ঘর আছে, সেখানে থাকবেন, রান্নাবাড়া করে খাবেন···আসুন দয়া করে···

আমি বৃদ্ধের কথায় ভারি সন্তুষ্ট হলুম। সত্যিই তো, সেকালের লোকেরা অন্য ধরনের শিক্ষায় মানুষ। অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করেই এদের তৃপ্তি। বৃদ্ধ এই প্রস্তাব না করলে রাঢ়-অঞ্চলের অজানা মেঠো পথ বেয়ে এই সুমুখ-আঁধার রাতে আমায় যেতেই তো হত মাখমপুরে, তিন ক্রোশ হেঁটে।

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বড় মাঠের ধারে বৃদ্ধের বাড়ি। বৃদ্ধের নাম নফরচন্দ্র দাস। আমি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে উঠতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

কুকুরের এই ডাকটা আমার ভালো লাগলো না; এর আমি কোন কারণ দিতে পারবো না,—কিন্তু এই কুকুরের চিৎকারে যেন একটা ছন্নছাড়া অমঙ্গলজনক অর্থ আছে—মঙ্গলসন্ধ্যায় কোন গৃহস্থবাড়িতে আসি নি, যেন শ্মশানভূমিতে এসেচি···

বৃদ্ধের বাড়ি দেখে মনে হল বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ির উঠোনে সারি সারি তিনটে বড় বড় ধানের গোলা—গোলার সঙ্গে প্রকাণ্ড গোয়ালঘর, বলদ ও গাইয়ে প্রায় কুড়ি বাইশটা। অন্তঃপুরের দিকে চারখানা বড় বড় আটচালার ঘর। বাইরের এই চণ্ডীমণ্ডপ ও তার পাশে আর একখানা কুঠরি!

আমার কথাটা ভালো করে বুঝতে গেলে এই কুঠরিটার কথা আর একটু ভালো করে শুনতে হবে। কুঠরিটিকে চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন একটা কামরাও বলা যায়, কারণ একটা সরু রোয়াকের দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের পেছন দিকের সঙ্গে সংলগ্ন; অথচ দোর বন্ধ করে দিলে বাইরের বাড়ির সঙ্গে এর সম্পর্ক চলে গিয়ে এটা ভেতরবাড়ির একখানা ঘরের সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আমায় বাসা দেওয়া হল এই কুঠরিতে। কুঠরির একপাশে ছোট একটা চালা। সেখানে আমার রান্নার আয়োজন করে দিয়েচে। হাত মুখ ধুয়ে সুস্থ হয়ে আমি বিশ্রাম করচি।

গৃহস্বামী এসে বললে, "ঠাকুরমশায় রান্না চাপান, আর রাত করেন কেন?"

আমি রান্নাচালায় বসে রান্না চড়িয়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি একটি বাড়ির বৌ

ভেতর থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে এসে আমার রান্নাচালার সামনে দিয়ে ঢুকলো ও ঝাঁট দিতে লাগলো।

কুঠরির দরজা খোলা, আমি যেখানে বসে সেখান থেকে কুঠরিটার ভেতর দেখা যায়। আমি দু-একবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলুম বৌটি ঝাঁট দিতে দিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। দু'তিন বার বেশ ভালো করে লক্ষ্য করে মনে হল বৌটি ইচ্ছে করেই আমার দিকে অমন করে চাইচে।

আমি দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলুম। ব্যাপার কি? সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ে, পল্লীর গৃহস্থবধূ—এমন ব্যবহার তো ভালো নয়? কি হাঙ্গামায় আবার পড়ে যাবো রে বাবা। কর্তাকে কাছে বসিয়ে রাঁধতে রাঁধতে গল্প করবো নাকি?

এমন সময় বৌটি ঝাঁট শেষ করে চলে গেল। কিন্তু বোধ হয় পাঁচ মিনিট পরেই আবার এল। দেখে মনে হল সে যেন খুব ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত। এবারও সে কুঠরির মধ্যে ঢুকে এটা ওটা সরাতে লাগলো এবং আমার দিকে চাইতে লাগলো, তারপর হঠাৎ রান্নাচালার দরজায় এসে চকিতদৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে কেউ নেই দেখে আমার দিকে আরও সরে এল এবং নিচু সুরে বললে, "ঠাকুরমশায়, আপনি এখনই এখান থেকে পালান, না হলে আপনি ভয়ানক বিপদে পড়বেন—এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত, রাতে আপনাকে মেরে ফেলবে"—বলেই চট করে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

শুনে তো আমি আর নেই! হাতের খুন্তি হাতেই রইলো, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল—আর সারা হাত-পা অবশ ও ঝিমঝিম করতে লাগলো। বলে কি! দিব্যি গেরস্তবাড়ি, গোলাগালা, ঘরদোর—ডাকাত কি রকম?

কিন্তু পালাবোই বা কেমন করে? এখন বেশ রাত হয়েচে। সামনের চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধ বসে লোকজনের সঙ্গে কথা কইচে—ওখান দিয়ে যেতে গেলেই তো সন্দেহ করবে!

কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচি একেবারে—হাতে পায়ে জোর নেই, কিছু ভাববারও শক্তি লোপ পেয়েচে। মিনিট পাঁচেক এমনি ভাবে কাটলো—এমন সময়ে দেখি সেই বৌটি আবার কি-একটা কাজে কুঠরির মধ্যে ঢুকে খোলা দরজা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মেয়েটি কথা বলবার পূর্বেই আমি বললুম, "তুমি যে হও, তুমি পরম দয়াময়ী—বলে দাও কোন্ পথে কি ভাবে পালাবো···"

বৌটি চাপা গলায় বললে, "সেই জন্যেই এলুম। সব দেখে এলুম। পালাবার পথ নেই—ওরা ঘাঁটি আগলে রেখেচে···"

আমি বললুম, "তবে উপায়!"

মেয়েটি বললে, "একটা মাত্র উপায় আছে। তাও আমি ভেবে এসেছি। আমি এ-বাড়িতে আর ব্রহ্মহত্যা হতে দেব না—অনেক সহ্য করেচি, আর করবো না···দাঁড়ান ঠাকুরমশায়, আর একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসি, নইলে সন্দেহ করবে।"

মিনিট পাঁচেক পরে বৌটি আবার এল, চকিতদৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে বললে, "শুনুন, আমার উপায়—এই কথা ক'টা মনে রাখুন। মনে যদি রাখতে পারেন, তবে বাঁচাতে পারবো। ···আমার নাম বামা, আমি এ-বাড়ির মেজবৌ, আমার বাপের বাড়ির গ্রামের নাম কুসুমপুর, জেলা বর্ধমান, থানা রায়না—আমার বাপের নাম হরিদাস মজুমদার, জ্যাঠামশায়ের নাম পাঁচকড়ি মজুমদার, আমরা দুই বোন, আমার দিদির নাম ক্ষান্তমণি, বিয়ে হয়েচে সামন্তপুর-

তেওটা, বর্ধমান জেলা। শ্বশুরের নাম দুল্লভ দাস—সবাই জাতে বারুই। আমার বাবা, জ্যাঠামশায় সব বেঁচে আছেন, কিন্তু মা নেই…"

আমার তখন বুদ্ধি লোপ পেতে বসেচে—যা বলে মেয়েটি তাই করে যাই। এতে কি হবে? বৌটি কিন্তু এক একবার বাড়ির মধ্যে যায়, আবার অল্প দু'মিনিটের জন্যে ফিরে এসে আমায় তালিম দিয়ে যায়—"মনে আছে তো? জ্যাঠামশায়ের নাম কি?"

আমি বললুম, "হরিদাস মজুমদার…"

"না—না, পাঁচকড়ি মজুমদার, বাবার নাম হরিদাস মজুমদার…আমার দিদির নাম কি? শ্বশুরবাড়ি কোন্ গাঁয়?…"

"ক্ষান্তমণি। শ্বশুরবাড়ি হল—শ্বশুরবাড়ি…"

"আপনি সব মাটি করলেন দেখচি! সামন্তপুর-তেওটা, বলুন…"

"সামন্তপুর-তেওটা—শ্বশুরের নাম রামযদু দাস—দুর্লভরাম দাস…"

অবশেষে মিনিট দশ-বারোর মধ্যে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে এসেচে।

বৌটি বললে, "রান্না-খাওয়া করে নিন ঠাকুরমশায়, কোন ভয় করবেন না। আমার বাপের বাড়ির নাম-ধাম যখন জানা হয়ে গেছে, তখন আপনাকে বাঁচাতে পেরেচি। এখন শুনুন,—খাওয়া-দাওয়ার পরেই শ্বশুরমশায়ের কাছে আমার বাপের বাড়ির পরিচয় দিয়ে বলবেন—আপনি তাদের গুরুবংশ, আমার নাম বলে জিগ্যেস করবেন—আমার বিয়ে হয়েচে কোথায়, জানো নাকি? গলা যেন না কাঁপে, কোনরকম সন্দেহ যেন না হয়…আমি চললুম, আবার আসবো আপনি শ্বশুরকে বলবার পরে; কিন্তু দেরি করবেন না বেশি, বিপদ কখন হয় বলা তো যায় না?…

রান্না-খাওয়া শেষ না করলেও তো সন্দেহ করতে পারে। রান্না-খাওয়া করতেই হল। রাত্রের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে এসেচে, রাত আন্দাজ দশটার কম নয়, আহারাদির পর নিজের কুঠুরিতে বসেচি, আর আমার মনে হচ্ছে এ বাড়ির সবাই যেন খাঁড়ায়, রাম-দাতে শান দিচ্ছে, আমার গলাটি কাটবার জন্যে।

এই সময় গৃহস্বামী স্বয়ং আমার জন্যে পান নিয়ে এল। বললে, "কি ঠাকুরমশায়, আহারাদি হল? এখন দিব্যি করে শুয়ে পড়ুন। মশারীটা টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি; রাত হয়েচে আর দেরি করবেন না…"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, একটা কথা বলি…আমাদের এক মন্ত্রশিষ্য, বাড়ি কুসুমপুর, থানা রায়না, নাম পাঁচকড়ি—ইয়ে, হরিদাস মজুমদার, তার একটি মেয়ের নাম বামা—এ দিকেই কোথায় বিয়ে হয়েচে। তারাও জাতে তোমাদের বারুই কিনা—তাই হয়তো চিনলেও চিনতে পারো। মেয়েটির জ্যাঠা দুর্লভরাম—ইয়ে পাঁচকড়ি—আমায় বলে দিয়েছিল মেয়েটির শ্বশুরবাড়ি খোঁজ করে একবার সেখানে যেতে…তা যখন এলুমই এ দেশে…"

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেল, আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে, "কুসুমপুরের হরিদাস মজুমদার? বামা?…আপনি তাদের চিনলেন কি করে?"

বামার কথা স্মরণ করে গলা না কাঁপিয়ে দৃঢ়স্বরে বললুম, "আমি যে তাদের গুরুবংশ—আমার বাবার ওরা মন্ত্রশিষ্য কিনা?"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললে, "বসুন, আমি আসচি…"

আমি একটা কুঠরির মধ্যে বসে রইলুম, সন্দেহ ও ভয় তখনও কিছু যায় নি। আর এরা যে গুরুদেবকেই রেহাই দেবে তা কে বলেচে?

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরে এল; পেছনে পেছনে সেই বধূটি, আর একজন ষণ্ডামার্কা গোছের যুবক এবং একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক—সম্ভবত বৃদ্ধের স্ত্রী।

বৃদ্ধ বললে, "এই যে বামা, ঠাকুরমশায়। আমারই মেজছেলের সঙ্গে···এই আমার মেজছেলে শম্ভু···গড় করো সব, গড় করো···মেজবৌমা, দেখতো, চিনতে পারো এঁকে?"

চমৎকার অভিনেত্রী বটে বামা! অদ্ভুত অভিনয় করে গেল বটে।

ঘোমটা খুলে হাসিমুখে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে গলায় আঁচল দিয়ে। জীবনদাত্রী, দয়াময়ী বামা! আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়লো।

তারপর সে রাত্রি তো কেটে গেল। খাবার জল দেবার ছুতো করে এসে বামা আমায় আশ্বাস দিয়ে গেল। বললে, "বিপদ কেটে গিয়েচে; আমার চোখে না পড়লে সর্বনাশ হত, ভিটেতে ব্রহ্মহত্যে হত। অনেক হয়েছে—এই কুঠরিতে,—এই বিছানায়, এই মেঝেতে অনেক লাশ পোঁতা···

আমার মনের অবস্থা বলবার নয়। বললুম, "পুলিশ কি গাঁয়ের লোক কিছু টের পায় না,—কিছু বলে না?

"কে কি বলবে! এ ফাঁসুড়ে ডাকাতের গাঁ। সবাই এ-রকম। আগে জানলে কি বাবা এখানে বিয়ে দিতেন? বিয়ের পর সব ধরা পড়ে গেল আমার কাছে। এখন আমার একটি সন্তান হয়েছে—এ পাপ-ভিটেয় বাস করলে তার অকল্যাণ হবে। ওকে বারণ করি, কিন্তু ও কি করবে? মাথার ওপর শ্বশুরমশায় রয়েচেন—পুরনো ডাকাত, দাদারা রয়েচে···আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আর ভয় নেই···"

সকাল হল। বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ আমায় পাঁচ টাকা গুরু-প্রণামী দিলে। বামাকে আড়ালে ডেকে বললুম, "তুমি আমার মা, আমার জীবনদাত্রী। আশীর্বাদ করি চিরসুখী হও মা···"

বামার মতো বুদ্ধিমতী নারী জীবনে আর আমার চোখে পড়ে নি। কতকাল হয়ে গেল, এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই দয়াময়ী পল্লীবধূটির স্মৃতিতে আমার চোখে জল এসে পড়ে, শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে!

বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি

বামাচরণের জন্মের সময় নকীপুরের যদু চক্কোত্তি বলেছিলেন, "এ ছেলে একদিন রাজা হবে।"

যদু চক্কোত্তি এ অঞ্চলের মধ্যে একজন বড় জ্যোতিষী, তার কথার দাম আছে। কিন্তু বামাচরণের জন্মদিনটির পরে বহু বছর কেটে গিয়েচে, রাজা হওয়া তো দূরের কথা, রাজসভার একজন ভালোগোছের প্রহরী হবার লক্ষণও তো বামাচরণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

অল্পবয়সে বামাচরণ তার মামার বাড়ি থেকে স্কুলে পড়তো। ফোর্থক্লাসে ওঠবার সময়ে ফেল করে সে লেখাপড়া দিলে ছেড়ে। বললে, "ছোট ছোট ছেলেরা উঠবে নিচে থেকে আমার ক্লাসে—তাদের সঙ্গে পড়তে লজ্জা করে।"

সুতরাং বামাচরণের লেখাপড়া হল না। মামারা বললে, "লেখাপড়া যদি না করো বাপু, তবে এখানে বসে বসে অন্নধ্বংস করে আর কি করবে, বাড়ি চলে যাও।"

বাড়ি এসে যখন সে বসলো, তখন তার বয়েস চৌদ্দ-পনেরো বছর। অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, সেখানে থেকে চাকরির চেষ্টা করা চলে না।

এই সময়ে তার এক ভগ্নীপতি তাদের বাড়িতে এলেন কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে। তিনি পশ্চিমে কোথায় রেলে চাকরি করেন, বামাচরণকে উপদেশ দিয়ে গেলেন;—টেলিগ্রাফি শিখতে। তা হলে রেলে চাকরি হবার সম্ভাবনা আছে। কলকাতা থেকে তিনি বামাচরণকে একটা টেঁকিকলও আনিয়ে দিয়ে গেলেন, আর টেলিগ্রাম শেখবার একখানা বই।

বামাচরণ সর্বদা গম্ভীর চালে থাকতো, সমবয়সী ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে মিশলে তার মান যাবে। আর একটা মজা ছিল তার, সে তাদের নানারকম বৈষয়িক উপদেশ দিত।

যেমন, হয়তো ছেলের দল ওদের বাড়ির সামনে কয়েতবেলের গাছে উঠে মহা হৈ-চৈ করচে, ও এসে গম্ভীর মুখে বললে, "এই সব, নাম—গাছ থেকে নাম।"

বামাচরণ বললে, "কয়েতবেল তো খাচ্ছিস, এদিকে ঘরে যে অনেকের চাল নেই, সে খোঁজ রাখিস? শুধু কয়েতবেলে কি আর পেট ভরবে? যা, যাতে দু'পয়সা রোজগার হয় তার চেষ্টা করগে যা।"

বামাচরণের বিজ্ঞ ধরনের কথাবার্তায় বেশ কাজ হল। পাড়াগাঁ জায়গা, সকলেরই অবস্থা অল্পবিস্তর খারাপ, প্রত্যেক ছেলেই জানে যে তার বাপ-মার অবস্থা ভালো নয়। অতএব বামাচরণের কথায় অনেকেরই মনের মধ্যে কোথায় ঘা লাগলো—তারা মাথা নিচু করে যে যার বাড়ি চলে গেল।

এই সময়েই ওর ভগ্নীপতি এসে ওকে টেঁকিকল দিয়ে গেলেন।

গ্রামের ছেলেরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতো, বামাচরণ দিনরাত গম্ভীর মুখে ওদের বাড়ির পশ্চিমের ঘরে বসে টেঁকিকলটাতে টরে-টক্কা অভ্যাস করচে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, দোল নেই, রাস নেই, শনিবার-রবিবার নেই। কি সে অধ্যবসায়! দ্রোণাচার্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখতে অর্জুনও বোধ হয় এত অধ্যবসায়, এত মনোযোগ দেখান নি—তা তিনি মল্লভূমিতে কাঠের বিবিধ পাখি বিদ্ধ করে যতই নাম করুন গিয়ে। বছর খানেক টেলিগ্রাফ শেখবার পর বামাচরণ রেলে চাকরির চেষ্টা করলে; কিন্তু অদৃষ্টের দোষে কোথাও কিছু হল না। গাঁয়ের ছেলেদের সে বলতো, "জানিস, ই.আর.আর. রেলের টি.আই. সাহেব আমার দরখাস্তের জবাব দিয়েচে? তার নিজের হাতের সই আছে।"

ছেলেদের মধ্যে দু-একজন সম্ভ্রমের সঙ্গে জিগ্যেস করতো, "কি লিখেছে বামাচরণ-দা?"

"লিখেছে, এখন চাকরি হবে না, পোস্ট খালি নেই। খালি হলে জানাবে। দাঁড়া…"

তারপর সে পশ্চিমের কোঠায় তার ঘর থেকে একখানা লম্বা খাম নিয়ে এসে তার মধ্যে থেকে ছোট্ট একটা ইংরেজি লেখা কাগজ বার করে সকলের সামনে বাতাসে দুবার উঁচু করে উড়িয়ে বলতো, "এই দ্যাখ!"

কিন্তু এত করেও কিছু হল না, মাসের পর মাস গেল, টি.আই. সাহেবের সে চিঠি আর পৌঁছুলো না।

হঠাৎ মেঘ-ভাঙা আকাশে একদিন চাঁদ উঠলো। বামাচরণের পিতা ছিলেন সেকালের ফৌজদারী কাছারির নাজির। যখন তিনি মেহেরপুরে, সে সময়ে বম্‌পাশ সাহেব মেহেরপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সাহেব নাজিরমশায়কে খুবই খাতির করতো, ভালোও বাসতো।

বামাচরণের বাবা বৃদ্ধবয়সে পেনসনভোগী অবস্থায় নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসে সমবেত বৃদ্ধ মণ্ডলীর কাছে চাকরি জীবনের গল্প করতে করতে বলতেন, "বম্‌পাশ সাহেবকে তো আমিই কাজ শিখিয়েছি, ছোকরা সিভিলিয়ান, নতুন বিলেত থেকে এসেছে তখন—ট্রেজারি অফিসের হিসেব রাখতে রাখতে জান বেরিয়ে যেত। আমায় বলতো, 'শোন নাজির, এ আমার পোষাবে

না, গাঁজা-আফিমের হিসেব রাখতে আর ওজন করতে করতে প্রাণ বেরুলো?' কত কষ্টে বুঝিয়ে সাহেবকে শান্ত করতুম।"

সে গ্রামে গভর্নমেন্টের চাকরি বামাচরণের বাবা ছাড়া কেউ করে নি—সবাই হাঁ করে থাকতো; পেনসনও ভোগ করচেন তিনি আজ বাইশ-তেইশ বছর কি তারও বেশি।

বামাচরণের বয়স যখন আঠারো-উনিশ বছর, তখন বামাচরণের বাবা গ্রামে বসে 'হিতবাদী' কাগজে দেখলেন বম্‌পাশ সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এসেছে।

তিনি গেলেন কলকাতায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। বম্‌পাশ সাহেবও আর ছোকরা নেই, পঞ্চাশের ওপর বয়স হয়েছে। পুরনো নাজিরকে চিনতে পারলে, জিজ্ঞেস করলে, "আমি তোমার কি উপকার করতে পারি, নাজির?"

এক কথায় বামাচরণের চাকরি ঠিক হয়ে গেল। খুলনায় সার্ভে ক্যাম্প পড়েচে, জমি জরীপ হচ্চে। বামাচরণের বাবা একগাল হেসে সকলকে কথাটা জানালেন। বামাচরণের বাড়িতে সত্য-নারায়ণের সিন্নি দেওয়া হল।

গাঁয়ের প্রতিবেশীরা যখন প্রসাদ খাচ্ছে ভেতরের ঘরের বারান্দায় বসে তখন বামাচরণের বাবা সবিস্তারে তাদের সামনে তাঁর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন : "সাহেব বললে, নাজির, তোমার ছেলে যদি এন্ট্রান্স পাশ করতো তবে আমি ওকে সাবডেপুটি করে দিয়ে যেতাম আজ।"

বামাচরণ চাকরি করতে গেল, সঙ্গে তার বৃদ্ধ পিতা গেলেন। কারণ বামাচরণের মা বললেন, ছেলেকে অত দূর দেশে একলা তিনি পাঠাতে পারবেন না।

আবার সেই অদৃষ্ট এসে বাধা দিলে। মাস দুইয়ের মধ্যে বামাচরণের বাবা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এলেন। শোনা গেল বামাচরণ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে। সেখানে নাকি থাকার কষ্ট, নদীর জল লোনা, কাছেই সুন্দরবন, সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়, জঙ্গল-থেকে কাঠ ভেঙে এনে রান্না করতে হয়। সেখানে কি ওই কচি ছেলে থাকতে পারে?

বামাচরণের বাবা বললেন, "কোন ভয় নেই। আমি আবার যাচ্ছি সাহেবের কাছে, আর একটা ভালো জায়গায় চাকরি যাতে হয়।"

কিন্তু এবার সাহেব বেজায় চটে গিয়েচে দেখা গেল, না জানিয়ে চাকরি ছেড়ে আসাতে। সাহেবের আরদালি বললে, সাহেবের এখন দেখা করবার সময় হবে না।

বামাচরণের বাবা এতটা ভাবেন নি, তিনি হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু সেই যে তাঁর মন কেমন ভেঙে গেল, এরপর আর বেশিদিন বাঁচেন নি।

ক্রমে দিন চলে গেল। বামাচরণের বয়স হয়ে উঠলো। বাবা বেঁচে থাকতেই তার বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন, দু' একটি ছেলেপুলেও হল।

গ্রামের যে সব ছোট ছোট ছেলেদের বামাচরণ গম্ভীর মুখে উপদেশ দিয়ে বেড়াতো, তাদের মধ্যে অনেকে এখন বিদেশে বেরিয়ে ভালো লেখা-পড়া শিখেচে, দু'একজন ভালো চাকরিও পেয়েচে। বাপের পেনসনের টাকায় সংসার একরকম চলতো, বাপের মৃত্যুর পর বড় সংসার ঘাড়ে পড়াতে বামাচরণ চোখে অন্ধকার দেখলে।

নিজের ছেলে-মেয়ে দু'তিনটি, এক বিধবা ভগ্নী বাড়িতে, তারও দু'তিনটি ছেলে মেয়ে, বৃদ্ধা মা,—অনেকগুলি পুষ্যি খেতে, চলে কিসে এতগুলি প্রাণীর?

* * *

এই সব কথাই সে ভাবছিল আজ নদীর ধারে বড়-ভাঙনের চট্‌কা গাছতলায় মাছ ধরতে বসে। বেলা পড়ে এসেচে, কচুরিপানার দামগুলো উজান মুখে চলেচে,—বোধ হয় জোয়ার এল।

সামনের চট্‌কাগাছটায় রোদ রাঙা হয়ে আসচে। রোজ এইখানটিতে বামাচরণ মাছ ধরতে আসে। তাদের গ্রাম থেকে প্রায় দেড়মাইল দূরে নদীর বড় বাঁকের মুখে, জায়গাটা চারিদিকে নির্জন।

এখন তার মনে হয় খুলনার চাকরিটা ছেড়েও এসেচে আজ চৌদ্দ-পনেরো বছর হবে।

হঠাৎ নদীর উঁচু পাড়ের দিকে তার নজর পড়লো;—ওটা কি?

পাড়টা সেখানে খুব উঁচু ও খাড়া—হাত ত্রিশ-চল্লিশ উঁচু সে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে। পাড়ের খানিকটা ভেঙে পড়েচে বোধ হয় দু'একদিন হল। সেই পাড়ের গায়ে একটা বড় কলসী পাড় ভাঙার দরুন বেরিয়ে পড়েচে—অর্ধেকটা দেখা যাচ্চে। বাকি অর্ধেকটা মাটির মধ্যে পোঁতা।

বামাচরণের চট করে মনে পড়ে গেল, সে গ্রামের বুড়োদের মুখে শুনেচে এই বাঁকের মুখে আগে—বহুকাল আগে, খুব সমৃদ্ধ গোয়ালাদের গ্রাম ছিল; অনেক লোকের বাস ছিল। কলসীটা জমির ওপর থেকে হাত চার-পাঁচ নিচে পোঁতা অবস্তায় রয়েচে। সেকালে লোকে কলসী করে টাকা পুঁতে রেখে দিত—এ নিশ্চয়ই টাকার কলসী।

বামাচরণ এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে আর কেউ কাছাকাছি আছে কিনা। স্থানটা নির্জন, অন্য লোক এদিকে আসে না। কলসীটা আর কেউ দেখে নি নিশ্চয়ই। তা ছাড়া মোটে কাল রাত্রে এই পাড় ভেঙেচে, কে আর লক্ষ্য করেচে একটা কানাভাঙা কলসী? কে-ই তারপর এসেচে এদিকে?

অবশ্য নৌকো থেকে দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু জেলে-ডিঙি এতদূরে আসে না, গাঁ থেকে ওই কদমতলা পর্যন্ত তাদের দৌড়। এতদূরে কেউ কোমড়-জাল পাতে না।

বামাচরণ সেখানে আর দাঁড়ালে না, ছিপ গুটিয়ে উঠে বাড়ির দিকে রওনা হল। তাকে এখানে কেউ না দেখে ফেলে।

বাড়িতে এসে সে ভাবতে বসলো। এখন সে কি করবে? আজ রাত্রেই অবশ্য কলসীটা তুলে আনতেই হবে। কিন্তু একা সে কি করে পারবে? জমির ওপর থেকে খোঁড়া অসম্ভব। যদি শাবলের ঘায়ে কলসীটা নদীগর্ভে পড়ে যায়, তা হলে স্রোতের মুখে হয়তো কোথায় ভেসে চলে যাবে, নয়তো ডুবে যাবে।

তা নয়, নিচে থেকে মই লাগিয়ে উঠতে হবে কলসী পর্যন্ত, তার পর সন্তর্পণে খুঁড়ে কলসী বার করতে হবে। তাতে অন্তত দুজন লোকের দরকার; মই নিচে থেকে একজন ধরে থাকা চাই, কলসী নামাবার সময়েও সাহায্য পাওয়া দরকার।

অনেক ভাবনাচিন্তার পরে বামাচরণ বড় ছেলে নিতাইকে সঙ্গে নেবার ঠিক করলে। নিতাই এই বারো বছরে পড়েছে, গ্রাম্য স্কুলে পড়ে, খেলাধুলায় খুব পটু আর সাহসীও বটে। বামাচরণ ছেলেকে বললে, "তোর মাকে বলিস নে, রাত্তিরে যাবি আমার সঙ্গে একটা জায়গায়।"

পিতাপুত্রে মই, শাবল একগাছা শক্ত দড়ি নিয়ে রাতদুপুরের পরে নদীর ধারে চট্‌কা গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালো।

বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করচে বামাচরণের, কি জানি কি হয়!

বামাচরণের ছেলে কিছুই জানে না কি ব্যাপার, বাবার কথায় সে এসেচে। কেন এসেছে তার বাবা তাকে বলে নি। কিন্তু সে জিনিসটা খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছিল। নিশ্চয়ই জেলেরা কোথাও জলের ভেতর বাঁশের ঘুনিতে বড় মাছ জিইয়ে রেখেচে—সেই মাছ চুরি করতে তার বাবা তাকে সঙ্গে করে এনেচে। কিন্তু মই কি হবে?

জায়গাটা দেখেও সে অবাক হয়ে গেল। বাবাকে বললে, "বাবা, এতদূরে তো জেলেরা কোমড় ফেলে না? এ তো চট্‌কাতলার বাঁক···"

তার বাবা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, "জেলেদের সঙ্গে আমাদের কি দরকার? নে, মইটা এখানে বেশ করে লাগা···"

অতিকষ্টে বামাচরণ মই বেয়ে উপরে উঠলো। নিতাই খুবই অবাক হয়ে গিয়েচে—পাড়ের ওপর মই দিয়ে উঠে কি হবে, কি আছে ওখানে? সে একটু হতাশও যে না হয়েচে এমন নয়। বড় মাছ নয়, তাহলে হয়তো বাবা কোনও ওষুধের শেকড় কি মুথোঘাসের শেকড় তুলতে এসেচে। অনেক সময় রাত্রেই ওষুধের গাছ তুলতে হয়, সে জানে।

তার ভয়ও হচ্ছিল, চারিদিকে অন্ধকার, নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে ডাঙায় ছোট ছোট ঢেউ লেগে। এখানে ভূতের উপদ্রবের কথা অনেকে বলে, শ্মশান এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। নিতাইয়ের গা-টা ছমছম করে উঠলো।

তার বাবা ওপরে গিয়ে পাড়ের গা খুঁড়তে লাগলো। সে নিচে থেকে অন্ধকারে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না বাবা কি খুঁজচে। একবার সে বললে, "কি বাবা, মুথোর শেকড়?"

বামাচরণ চাপাগলায় বললে, "আঃ, চুপ কর্ না! মই ধরে থাক, তোর সে কথায় দরকার কি?"

নিতাই চুপ করে রইলো, কিন্তু ওষুধ খুঁড়তেও কি এত সময় লাগে? সে অন্ধকারের মধ্যে মইয়ের নিচে একা দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করছিল, বাবার ভয়ে কিছু বলতেও পাচ্ছে না।

অবশেষে অতি কষ্টে ভারী ও কালো একটা কলসী নিয়ে বামাচরণ মই থেকে নামলো। নিতাই অবাক হয়ে বললে, "কি বাবা এতে?"

"চুপ কর্ না, কেবল চেঁচামেচি! তোর সব কথায় কি দরকার? শাবল আর মইটা নিতে পারবি একলা?"

কেউ না দেখে এজন্যে বামাচরণ বাঁশবনের পথ দিয়ে চললো। বেশি রাত্রে গ্রামে চৌকীদার পাহারা দিতে বার হয়, কি জানি যদি সে এ অবস্থায় হঠাৎ চৌকীদারের সামনেই পড়ে যায়?

বামাচরণের বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্ করচে। কলসীটা বেজায় ভারী। নিশ্চয়ই কোনো ভারী জিনিসে ভর্তি। কলসীর মুখটা একখানা পাথরের ছোট খুরি দিয়ে চাপা ছিল—বহুদিন মাটির মধ্যে থাকার দরুণ সেটা এমন দারুণ এঁটে গিয়েচে যে অস্ত্র দিয়ে চাড় না দিলে খোলা যাবে না।

বাড়ি পৌঁছেই বামাচরণ বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলে। স্ত্রীকে বললে, "একটা আলো নিয়ে এসো তো?"

ওর আর বিলম্ব সইচে না। এখুনি সে কলসীর মুখ খুলে দেখবে।

নিতাইয়ের মা একটা কাচ-ভাঙা সেকেলে হিঙ্কসের লণ্ঠন নিয়ে উঁচু করে ধরলে।

বিস্ময়ের সুরে বললে, "কলসীটাতে কি? মড়ার কলসীর মতো দেখতে,—ওটাকে আনলে কোথা থেকে গো?

অধীর কৌতূহলে ও আগ্রহে বামাচরণ শাবলের এক ঘা দিয়ে কলসীটা ফাটিয়ে ফেললে—সঙ্গে সঙ্গে কালো আলকাতরার মতো কি একটা দুর্গন্ধ পদার্থ মেঝেময় ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

নিতাইয়ের মা অবাক, স্বামী পাগল হয়ে গেল নাকি পয়সার দুর্ভাবনায় এতদিন পরে?

"রাতদুপুরে কিসের একটা কলসী কোথা থেকে উঠিয়ে এনে কি কাণ্ড বাধালে দেখো তো?"

বামাচরণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। এত কষ্ট তবে সব বৃথা। রুপোর গুঁড়োও এতটুকু নেই কলসীটাতে। কোথায় এক কলসী টাকা বা মোহর—আর তার বদলে—এগুলো কি কালো কালো? অদৃষ্ট একেই বলে।

সারারাত্রি বামাচরণের ঘুম হল না। সত্যিই তার অদৃষ্ট ভালো নয়। এমন জায়গায় পোঁতা কলসী পেয়েও তার মধ্যে থেকে বেরোয় কালো আলকাতরা! না হলে বম্‌পাশ সাহেবের দেওয়া এমন চাকরি সে ছেড়ে দিয়ে আসে? পেয়ে হারানোই তার অদৃষ্ট।

পরদিন সকালে লোকজনকে আলকাতরার মতো জিনিসটা দেখাতে কেউ কিছু বলতে পারে না। অবশেষে মামুদপুরের বাজারের বুড়ো কবিরাজমশায় দেখে বললেন, "এ পুরনো ঘি। বহুকালের পুরনো ঘি। কতটা আছে? এর দাম খুব। বিক্রি করবে? কলকাতায় বৌবাজারের সেনেদের দোকানে পেলেই নেবে।"

বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে বামাচরণ কলকাতায় এল।

বৌবাজারের সেনেদের মস্ত কবিরাজী দোকান, সারা ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কারবার। ঘি দেখে তারা বললে, "হ্যাঁ জিনিসটা খুবই ভালো, অন্তত দুশো বছরের পুরোনো। তোমাদের ঘরে ছিল?"

বামাচরণ সংক্ষেপে কলসী-প্রাপ্তির কথা বর্ণনা করলে। তারপর দরদস্তুর চললো, ওরা সাতটাকার বেশি দর দিতে রাজী নয়, তারপর উঠলো দশ টাকায়, তার বেশি কিছুতেই নয়। বুড়ো কবিরাজকে সঙ্গে না আনলে কিন্তু বামাচরণ দু-টাকা সেরেই জিনিসটা দিয়ে ফেলতো।

একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে ওদের কথাবার্তা শুনেছিলেন; তিনি উঠে এসে বুড়ো কবিরাজকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আমি খয়রাগড়ের রাজার ম্যানেজার। আমি আপনাদের কথাবার্তা এতক্ষণ শুনছিলাম—রাজার মায়ের বয়স হয়েচে, হাঁপকাশের অসুখ। এই পুরোনো ঘি কিনতেই আমি এদের দোকানে এসেছিলাম। এত বছরের পুরোনো ঘি কলকাতার কোন দোকানে নেই। আমি আপনাদের জিনিস নেবো। একশো টাকা করে সেরের দাম দেবো আমি। ওজন করুন মাল।"

এ কলসীতে মোট সাড়ে বারো সের ঘি ছিল। কিন্তু আদত কলসীটাতে বোধ হয় আরও বেশি ছিল, কিন্তু সেটা ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। বাকিটা ওরা নতুন কলসীতে পুরে এনেছিল।

ঘি বিক্রি করে মোট পাওয়া গেল সাড়ে বারশো টাকা।

যদু চক্কোত্তি জ্যোতিষী ছিল বড়, সে মিথ্যে বলে নি—এখন তো বামাচরণের অনন্তকাল পড়ে রয়েচে। রাজা হওয়ার আশ্চর্যটা কি?

বেশি দিনের কথা নয়, গত ফাল্গুন মাসের কথা। দোলের ছুটিতে গালুডি বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলি যে সিংভূম জেলার এই অঞ্চলে আমি অনেকবার গিয়েচি এবং এখানে আমার কয়েকটি বন্ধু বাড়িও করেচেন, ছুটি-ছাটাতে গিয়ে কিছুদিন যাপন করবার জন্যে।

গালুডি ক্ষুদ্র গ্রাম, এ থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে দূরে সব দিকেই পাহাড়ের শ্রেণী ও জঙ্গল। দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখার ওপারে সিদ্ধেশ্বর ও ধনঝরি শৈলমালা, তার ওদিকে তামাপাহাড় নামে একটি অনুচ্চ পাহাড়; এখানে কয়েক বৎসর পূর্বে একটা তামার খনি ছিল, কোম্পানি ফেল হয়ে যাওয়াতে ঘর, বাড়ি, কারখানা, চিমনি, ম্যানেজারের বাংলো সবই পড়ে আছে, মানুষ জন নেই। জায়গাটার নাম রাখা মাইন্‌স্। এই নামে একটা ছোট রেলস্টেশনও আছে দেড় মাইল দূরে। রাখা মাইন্‌স্ এবং তার আশেপাশে ঘন জঙ্গল ও পাহাড়, মাঝে সাঁওতালী বন্য গ্রাম। এই সব বনে হস্তী আছে, শঙ্খচূড় সাপ আছে, ভাল্লুক তো আছেই। এই জঙ্গলে যখন-তখন চলাফেরা করা বিপজ্জনক, বন্দুক না নিয়ে কখনও যাওয়া উচিত নয়।

এই পরিত্যক্ত নির্জন স্থানে একটা ভগ্নপ্রায় খড়ের বাংলোতে এক মাদ্রাজী কবিরাজ থাকতেন, তাঁর সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছিল। তাঁর মুখে গল্প শুনেচি—কিছুদিন আগে দুই বুনো হাতীর লড়াই হয়েছিল পুরোনো কারখানার কাছে। দুদিন ধরে লড়াই হয়, শেষকালে একটা হাতী মারা যায়। বেশি রাত্রে তাঁর বাংলোর বারান্দায় বাঘ ডাকে, সম্পূর্ণ দিনের আলো না ফুটলে তিনি কখনও বাংলোর বারান্দার দিকের দোর খোলেন না।

আমি ইতিপূর্বে অনেকবার যখন গালুডি গিয়েচি, তখন রাখা মাইন্‌স্ ও তার আশেপাশের বনে বেড়াতে গিয়েচি একা একা। একা যাওয়ার কারণ প্রথমত তো ওসব বনের মধ্যে স্বাস্থ্যান্বেষী অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত শৌখীন কলকাতার বাবুরা পায়ে হেঁটে যেতে রাজী হন না, দ্বিতীয়ত গভীর বনের মধ্যে বেড়ানোর শখও সবার থাকে না—এতে তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না অবশ্য। অনেকবার বেড়িয়ে বনের মধ্যে কিছু কিছু জায়গা পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয় তখন লোকে স্বভাবতই সেখানে একটু অসতর্ক হয়ে পড়ে। আমিও তাই হয়েছিলাম; ওদেশে বনে বেড়াতে হলে সাধারণত সকালের দিকে যাওয়াই নিয়ম, বেলা দুটো তিনটের পর অর্থাৎ পড়ন্ত বেলার দিকে বনের মধ্যে থেকে বার হয়ে লোকালয়ের দিকে আসাই ভালো।

প্রথম প্রথম এ-নিয়ম খুবই মেনে এসেচি। একজন করে সাঁওতাল গাইড্ সঙ্গে না নিয়ে বনে যেতাম না। একবার সিদ্ধেশ্বরডুংরি বলে প্রায় পনেরো শ' ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলাম, সেবারও সঙ্গে ছিল একজন সাঁওতাল ছোকরা। পাহাড়ের ওপর অনেক উঁচুতে বুনো হাতীতে চারা কেঁদগাছ ভেঙে দিয়েচে সেই পথপ্রদর্শক সাঁওতাল ছোকরা আমায় দেখায়। চীহড় ফল,—এক রকম বুনো সীমের মতো ফল, তার বীজ পুড়িয়ে খেতে ঠিক গোলআলুর মতো—সে-ই পুড়িয়ে খাইয়েছিল পাহাড়ের ওপরকার জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে। পাহাড়ের এক জায়গায় একটি গুহা দেখিয়ে বলেছিল, এ গুহা এখান থেকে সুবর্ণরেখার ওপার পর্যন্ত চলে গিয়েচে।

এ-সব অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। যাঁরা ঘন অরণ্যানী, নির্জন শৈলমালার

সৌন্দর্য ভালবাসেন তাঁদের এ সব স্থানে আসা দরকার। বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ক্ষীণকায়া পার্বত্য নদী—হয়তো হাঁটুখানেক জল ঝিরঝির করে বইচে পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে। দু-ধারেই জনহীন বনভূমি, কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল, ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ, কত বিচিত্র বন্যপুষ্প, বন্য শেফালির বন। বার বার যাতায়াত করতে করতে ভয় ভেঙে গেল। যখন নিজের চোখে কখনও ভাল্লুক দেখলাম না, বা বুনো হাতীর তাড়া সহ্য করতে হল না, তখন মনে হল অনর্থক কেন একজন গাইড্ নিয়ে গিয়ে পয়সা খরচ করা। যেতে হয় একাই যাবো।

অর্থব্যয় ছাড়া গাইড্ নিয়ে ঘোরার অন্য অসুবিধাও ছিল। ধরুন, এক জায়গায় চমৎকার বন্য-পুষ্পের শোভা, পাহাড়ের নীল চূড়া সুনীল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, নিকটেই ক্ষুদ্র পার্বত্য ঝরনার মৃদু কলধ্বনি, বনস্পতিদের শাখায় শাখায় বন্য পক্ষীর কূজন,—আমার মনে হল এখানে অদূরবর্তী শিলাখণ্ডে পিয়াল গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি, আপন মনে প্রকৃতির এই নিরালা রাজ্যে বসে বনবিহগ-কাকলী শুনি; কিন্তু গাইড্ দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসতে দেবে না, বলবে, "চলো বাবুজী, চলো, এখনও অনেক পথ বাকি!"—তা ছাড়া সঙ্গে লোক থাকলে মনের সে শান্ত, সমাহিত ভাবও আসে না।

এই সব কারণে ইদানীং একাই বেড়াতে যেতাম বনের মধ্যে। কিন্তু যে ঘটনার কথা এখানে বলবো, তার পূর্বে সুবর্ণরেখার ওপারে দু'তিন মাইল ছাড়া একা খুব বেশি দূরে যাই নি, বড় জোর গিয়েচি সিদ্ধেশ্বর পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত। গিয়েচি, আবার বেলা পড়বার অনেক আগেই সুবর্ণরেখার তীরে ফিরে এসেচি।

দোলের ছুটিতে এবার গালুডি গিয়ে দেখি অপূর্ব নির্মেঘ নীল আকাশ। বনে বনে শাল-মঞ্জরির সুগন্ধ, নব বসন্তে নতুন কচি-পাতা-ওঠা শাল, কেঁদ, পিয়াল, মহুয়া, গাছে গাছে কুঁড়ি দেখা দিয়েচে। বসন্তের বন্যা এসেচে পাহাড়ী ঝরনার মতো নেমে—বিচিত্র বর্ণে, বিচিত্র সজ্জায় বনে বনে।

একজন বৃদ্ধ সাঁওতালের মুখে শুনেছিলাম পাঁচ মাইল দূরে বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছোটখাট জলপ্রপাত আছে—জায়গাটার নাম নিশিঝরনা। সেখানে নাকি বন আরও ঘন, পথে এক জায়গায় পুরোনো আমলের একটা দেউল আছে ইত্যাদি। জায়গাটা দেখবার খুব ইচ্ছে হল। দোলের আগের দিন বেলা দশটার মধ্যে কিছু খেয়ে নিয়ে জায়গাটার উদ্দেশ্যে বার হয়ে পড়লাম।

শীঘ্রই সুবর্ণরেখা পার হয়ে গিয়ে রাখা মাইন্স্-এর পথ ধরলাম। মুসাবনী রোড যেখানে রাখা মাইন্স্-এর চার নম্বর শ্যাফ্টের গভীর বনের মধ্যে গালুডির পাকা রাস্তার সঙ্গে মিশেচে—সেখানে পৌঁছতে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। তারপর বাঁধা সড়ক ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকে কুলামাড়ৌ বলে একটা ক্ষুদ্র বন্যগ্রাম পার হয়ে পায়েচলা সুঁড়িপথ ধরে ধন্ঝড়ি পাহাড়ের নিচেকার ঘন বনের মধ্যে ঢুকলাম! পথ যে আমার একেবারে অপরিচিত তা নয়, আর বেশিদূর অগ্রসর না হলেও কুলামাড়ৌ গ্রামে সাঁওতালী উৎসবে সাঁওতালী নৃত্য দেখতে এর আগেও একবার এসেচি। সুতরাং আমার মনে দ্বিধা বা ভয় থাকবার কথা নয়, ছিলও না।

কুলামাড়ৌ পেছনে ফেলে চলেচি, আমার ডাইনে ধন্ঝরি পাহাড় সরু বন্য পথের সমান্তরাল ভাবে যেন বরাবর চলেচে উত্তর-দক্ষিণ কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে। বন ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে তা বেশ লক্ষ্য করচি। কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিক থেকেও

আর একটা শৈলশ্রেণী যেন ক্রমশ ধন্‌ঝরির গায়ে মেশবার চেষ্টা করচে। যে অরণ্যাবৃত উপত্যকা দিয়ে আমি চলেচি সেটা যেন ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসচে। আমার জানা ছিল এই পথটা বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় ধন্‌ঝরি পাহাড় পার হয়ে ওপারে চলে গিয়ে আবার মুসাবনী রোডের সঙ্গে মিশেচে। সুতরাং মনে কোন উদ্বেগ ছিল না। জানি, যেতে যেতে আপনা-আপনি মুসাবনী রোডে পড়বোই। নিশিঝরনা কোথায় আমার জানা ছিল না; আমি বনের মধ্যে যেতে যেতে কান খাড়া করে আছি কোথায় ঝরনার শব্দ পাওয়া যায়। এক জায়গায় সত্যিই শব্দ পাওয়া গেল জলের, সুঁড়িপথটা ছেড়ে নিবিড়তর বনের মধ্যে ঢুকে দেখি একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী উপলরাশির উপর দিয়ে বয়ে চলেচে; তার দু'ধারে এক প্রকার বন্য গাছ—অজস্র বেগুনী রঙের ফুল ফুটে আছে। স্থানটি যেমন সুন্দর তেমনি স্নিগ্ধ, কতক্ষণ বসে রইলাম একটা শিলাখণ্ডে, উঠতে যেন ইচ্ছে করে না।

কিন্তু এই বনে থাকা তখন যে উচিত ছিল না, তা তখন বুঝি নি। প্রথমত তো বনের ও সব নিভৃত স্থানে—বিশেষ করে যেখানে জল থাকে, সেখানে বাঘ থাকা বিচিত্র নয়, দ্বিতীয়ত বেলা গেল, পথ তখনও কত বাকি সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না—অথবা ধারণা থাকলেও ভুল ধারণা ছিল। যখন আবার সুঁড়িপথটায় উঠলাম তখন বেলা বেশ পড়ে এসেচে।

বনের এই অংশের শোভা অবর্ণনীয়। প্রথম বসন্তে কত কি বনের ফুল গাছের মাথা আলো করে রেখেচে, ধন্‌ঝরির নীল সানুদেশ এক দিকে খাড়া হয়ে উঠেচে ডাইনে, শালমঞ্জরির সুবাসে উপত্যকার বাতাস নিবিড় হয়ে উঠেচে, বেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে গন্ধটি যেন আরও বাড়চে; কতক্ষণ অন্যমনে চলেছি, সুঁড়িপথটা কখন হারিয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখি আমার সামনেই ধন্‌ঝরি পাহাড়ের খুব উঁচু একটি অংশ, সেখানে পাহাড় টপকে ওপারে যাওয়ার কোন উপায় নেই—পথও নেই। স্থানটি সম্পূর্ণ জনমানবহীন। সেই কুলামাড়ৌ গ্রাম ছাড়িয়ে এসে আর লোকালয় চোখে পড়ে নি। বেলাও পড়েচে, একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তা ছাড়া সুঁড়িপথটাই বা গেল কোথায়? বনের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পথ খুঁজতে গিয়ে আরও গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

এ দিকে সূর্য হেলে পড়েচে। এ বনের মধ্যে আর বেশিক্ষণ দেরি করা উচিত হবে না। ভাবলাম, আর নিশিঝরনা দেখে দরকার নেই, এবার যে পথে এসেছি সেই পথেই ফিরি। কিন্তু কোথায় সে পথ? ক্রমে এমন সব জায়গার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখান দিয়ে আসবার সময় আসিনি তা বেশ বুঝলাম। বনের মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হওয়া খুব সহজ, বিশেষ করে এ ধরনের নিবিড় বনের মধ্যে। কিন্তু আমি জানি ধন্‌ঝরি উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে বিস্তৃত, বিশেষত সূর্য যখন এখনও আকাশে দেখা যাচ্ছে, তখন দিক ভুলের সম্ভাবনা অন্তত নেই—এই একটা ভরসা ছিল মনে। কিন্তু ভরসা ভরসাই রয়ে গেল সেই পর্যন্ত, কোনও কাজে এল না। সূর্য ক্রমে পাহাড়ের আড়ালে অস্ত গেল। ছায়া ঘনিয়ে এল বনে। যদিও সামনে জ্যোৎস্না রাত্রি, তবুও এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা রাত্রি কাটানোর সম্ভাবনায় বিশেষ পুলকিত হয়ে উঠলাম না।

হঠাৎ মনে হল ধন্‌ঝরি পাহাড়ের ওপারেই তো মুসাবনী রোড। পাহাড়টা যদি কোনও রকমে টপকাতে পারি, এখনও রাত হয়নি, লোকালয়ে পৌঁছতে পারবো। নতুবা ঘনায়মান সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে যতই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরবো ততই সম্পূর্ণরূপে পথভ্রান্ত হয়ে পড়তে হবে। একটা জায়গায় মনে হল যেন ধন্‌ঝরি একটু নিচু হয়েচে। এই ধরনের নিচু খাঁজ দিয়েই আমার জানা পায়ে-চলার সুঁড়িপথটা গেছে—ঘন চুলের মধ্যে চেরা সিঁথির মতো;

পার্বত্য পথের কোন চিহ্নই দেখছি না কোন দিকে, তবুও এই অপেক্ষাকৃত নিচু থাক টপকে ধনঝরির ওপারে যাওয়া খুব কঠিন হবে না মনে হয়।

জুতো খুলে হাতে নিলাম। পাহাড়ের কিছুদূর উঠে গিয়ে দেখি নিচে বনের মধ্যে যত অন্ধকার ওপর ততটা নয়। জ্যোৎস্না উঠলো, জ্যোৎস্না ফুটবে ভালো। প্রথম খানিকটা উঠেই মনে হল ভুল জায়গা দিয়ে পাহাড় পার হচ্ছি, এখান দিয়ে কখনও কেউ পাহাড় পার হয়নি—যেমন বড় বড় পাথরের চাঁই, তেমনি কাঁটা গাছ সর্বত্র। খালি পায়ে ধারালো পাথরের ওপর দিয়ে চলতে বিষম কষ্ট, অথচ জুতো পায়ে দেওয়াও চলে না।

পাহাড়ের ওপরে খানিকটা উঠে গেলাম দিব্যি। তারপরে এক জায়গায় গিয়ে দেখি সামনে একেবারেই খাড়াই—দুরারোহ পাহাড় দেওয়ালের মত উঠেচে। বড় বড় গাছের শেকড় ঝুলচে, যেন জলের তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে পড়েচে। আমি শিক্ষিত পর্বতারোহণকারী নই, সেই খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে ওঠা আমার পক্ষে তাই সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এদিক ওদিক চেয়ে দেখি একদিকে একটা মসৃণ প্রকাণ্ড শিলা আড়ভাবে শোয়ানো, সেখানা উচ্চতায় আন্দাজ কুড়ি-বাইশ হাত এবং চওড়ায় ত্রিশ-বত্রিশ হাত হবে। এ ধরনের পাথরকে এদেশে 'রাগ্' বলে। 'রাগ্' পার হওয়া বিপজ্জনক, কারণ হাত-পা দিয়ে ধরবার এতে কিছু থাকে না। তবে এখানা অন্তত ৬০ ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে বলে ভরসা হল; এই একমাত্র পথে পাহাড়ের ওপরের দিকে ওঠা চলবে এখন।

জুতো যখন পায়ে নেই এক রকম করে চার হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে 'রাগ্' পার হয়ে ওপরে উঠলাম। তারপরে ওঠার বিশেষ কষ্ট নেই, শুধু অর্জুন আর শুভ্র নিষ্পত্র শিববৃক্ষের জঙ্গল, বাঁকাভাবে চাঁদের আলো এসে শিববৃক্ষের দুধের মতো সাদা ধবধবে গুঁড়ির গায়ে পড়েচে। কারণ তখন প্রদোষের ঈষৎ অন্ধকার কেটে জ্যোৎস্না ফুটে উঠেচে। এক জায়গায় ওপর দিকে মনে হল যেন গাছে আগুন লেগে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কৌতূহল হল অত্যন্ত, আপনি আপনি গাছে কি করে আগুন লাগবে? ওপরে উঠে গিয়ে দেখি সত্যিই এক জায়গায় একটা মোটা শেকড়ের গা দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে—তবে কি ভাবে শেকড়ে আগুন লাগলো তা আজও বলতে পারি না।

তখন আমি অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়েচি, নিম্নের উপত্যকার গাছপালার মাথা কোঁকড়া-চুল কাফ্রিদের মাথার মতো দেখাচ্ছে; চাঁদের আলো বনের নিবিড় অন্ধকার উপত্যকার মধ্যে এতটুকু ঢোকে নি, ওপর থেকে ঘন কালো দেখাচ্ছে। আর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে চারিদিকে ধন্‌ঝরির বিভিন্ন চূড়ার বনরাজির মাথায় মাথায় শুভ্র ঢেউ। সে জনমানবহীন শৈলমালার ঊর্ধ্ব সানুতে জ্যোৎস্না-প্লাবিত শুক্লা চতুর্দশী রাত্রির শোভা যে দেখে নি তাকে বলে বোঝানো যাবে না সে কি অপূর্ব ব্যাপার! একা যেন আমি পৃথিবীর ঊর্ধ্বে কোন দেবলোকে বিচরণশীল আত্মা; আমার চোখের সম্মুখে যে দৃশ্য দূর থেকে সুদূরে প্রসারিত, কোনও পার্থিব চক্ষু কোনদিন তা দর্শন করেনি। কিন্তু সেখান থেকে আমার মনে হল আমি সম্পূর্ণ ভুল করেচি, যে দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠেচি সেখান দিয়ে পাহাড় টপকাবার উপায় নেই—যতই উঠি ততই দেখি আমার চোখের সামনে অর্জুন ও শিববৃক্ষের সাদা সাদা সোজা গুঁড়িগুলো থাকে থাকে উঠে যেন স্বর্গে উঠেচে। অর্থাৎ পাহাড়ের শিখর দেশের তখনও পর্যন্ত কোনও পাত্তাই নেই। তাছাড়া ক্লান্তও খুব হয়ে পড়েচি। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে যেন ঢেঁকির পাড় পড়চে অতিরিক্ত শ্রমের ফলে। এই বন ভেঙে অতখানি উঠে ওপারের

ঢালু দিয়ে নামতে পারবো বলে মনে হল না—তার চেয়ে যে পথে উঠেচি হাত-পা ভেঙে মরার চেয়ে নিম্ন উপত্যকায় নেমে জ্যোৎস্নার আলোয় আবার না হয় পথ খুঁজি। বিপদ এল এতক্ষণে এই নামবার সময়, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে; একেবারে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হল প্রায়। দুর্ঘটনা যখন আসে তখন এমনি অতর্কিতে আসে।

যতটা উঠেছিলাম জ্যোৎস্নার আলোতে একরকম করে নেমে এসে সেই 'রাগ্' খানার কাছে পৌঁছলাম। 'রাগ্' পার হয়ে নেমে গেলে উপত্যকা আর বেশি নিচে নয়।

'রাগ্' বেয়েই নামতে হবে, কারণ অন্য দিকে নামবার কোন উপায় নেই। অথচ 'রাগ্' এমন মসৃণ যে হাত পায়ে আঁকড়াবার কিছু নেই—এ ধরনের পাথর বেয়ে ওঠা বরং সহজ, কিন্তু নামা অত্যন্ত কঠিন। তাড়াতাড়িতে আর একটা ভুল করলাম, উপুড় হয়ে না নেমে চিৎ হয়ে নামতে গেলাম। যাই হোক, খানিকটা তো নামলাম দিব্যি, তারপর পাথরখানার ওপর দিকের যে প্রান্ত হাত দিয়ে ধরেচি সেটা ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে সড়্ সড়্ করে খানিকটা নামলাম। তারপর পাথরের গায়ে এক জায়গায় একরাশ শুকনো পাতা জমে আছে, সেখানটিতে পাথরের কোন খাঁজ আছে ভেবে যেমন পা নামিয়ে দিয়েচি অমনি শুকনো পাতার রাশ হড়্ হড়্ করে সরে গেল—সেই ঝোঁকে আমিও খানিকটা গড়িয়ে পড়লাম। অথচ পায়ে আটকাবার কোন খাঁজ বা উঁচু-নিচু জায়গা কিছুই পেলাম না।

তখন আমার অবস্থা সঙিন হয়ে উঠেচে। কোথাও কিছু ধরবার নেই—শ্লেটের মতো মসৃণ পাথরখানার কোন জায়গায়। আমি চিৎ হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় তার ওপর শুয়ে আছি এবং আঙুল টিপে বা সামান্য কিছু ধরে আছি, সেটা ছেড়ে দিলেই নিচের দিকে গড়িয়ে পাথরের নুড়ির স্তূপের ওপর গিয়ে পড়বো। যে পাথরের স্তূপ অন্তত ত্রিশ ফুট নিচে, তার ওপর পড়লে তীক্ষ্ণ ধারালো অসমান প্রস্তরখণ্ডে বিষম আহত হতে হবে। তারপর হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকলে এ জনশূন্য পাহাড়ের ওপরে কে-ই-বা উদ্ধার করচে? এ অবস্থায় মৃত্যু ঘটা বিচিত্র কি?

যখন আমি বুঝলাম আমি খুব বিপদগ্রস্ত তখন হাত-পায়ে যেন আর বল নেই। আঙুলে টিপে ধরব কি, আঙুলই অবশ হয়ে আসচে। এভাবে আর কিছুক্ষণ কাটলেই গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবো এবং সাংঘাতিক আহত হব।—তখন মনে হল ওঠবার সময় পাথরখানার এ অংশ দিয়ে উঠি নি, কোণ ঘেঁষে উঠেছিলাম। সেখানে নিচে ছোটবড় অসমান শিলাখণ্ডের ধাপমতো ছিল, তখন দিনের আলো ছিল বলে দেখে শুনে ওঠবার সুবিধা ছিল, এখন রাত্রে বিশেষ করে ওপরের দিক থেকে নামবার সময় অতটা বুঝতে পারি নি।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারিদিকে চাইলাম, জলে ডোবার পূর্ব মূহূর্তে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোন আশ্রয় খোঁজে, তেমনি। হঠাৎ নজরে পড়লো হাত খানেক দূরে একটা অর্জুন গাছের মোটা শেকড় ওপরের একখানা শিলাখণ্ডের ফাটল থেকে বার হয়ে ঝুলচে। মরীয়ার মতো সাহসে ঝোঁক দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সেই শেকড়টি আঁকড়ে ধরতে গেলাম এবং ধরেও ফেললাম। এতে নিজেকে আরও বিপন্ন করেছিলাম—কারণ শেকড় হাতের নাগালে না এলে টাল খেয়ে পড়ে গিয়ে সজোরে নিচের প্রস্তররাশির উপর পড়ে চূর্ণ হয়ে যেতাম—ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়লে হয়তো চোট খেয়ে বেঁচে যেতাম, এতে কিন্তু বাঁচবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না।

'রাগ্' থেকে শেকড় ধরে নেমে এসে সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ঝাল বেরুচ্ছে বলে মনে হল!—নিশ্চিন্ত দুর্ঘটনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে যেমন হয় মানুষের। কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করে নিয়ে হাত-পায়ের অবশ ভাবটা কাটিয়ে আবার নামতে আরম্ভ করলাম এবং পনেরো

মিনিটের মধ্যেই ধন্‌ঝরির উপত্যকার সমতল ভূমিতে পা দিলাম।

তখন আমার মনে সাহস বেড়ে গিয়েচে। গুরুতর দুর্ঘটনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সমতল ভূমিতে কোন বিপদই আর আমার কাছে বিপদ নয়। তখন রাত আন্দাজ দশটা হবে মনে হল। জ্যোৎস্না খুব ফুটেচে, বনের মধ্যে আগের মতো অত অন্ধকার নেই। প্রথমে সেই পার্বত্য নদীর ধারে এসে পৌছলাম তার জলের কলধ্বনি শুনে। জল পান করে ও মাথায় মুখে জল দিয়ে শরীর ও মন সুস্থ হল। মনে তখন ভয় বা উদ্বেগ আদৌ নেই। সুতরাং ধীর মস্তিষ্ক নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে সেই সুঁড়িপথটা প্রায় আধঘণ্টা পরে বার করলাম।

কুলামাড়ৌ যখন এসে পৌঁছেচি তখন রাত বারোটার কম নয়। গ্রাম নিষুতি হয়ে গেছে বহুক্ষণ; আমায় দেখে গ্রাম্য কুকুরের দল মহা ঘেউ ঘেউ শুরু করলে। একটা ঘরের দাওয়ায় লোকেরা শুয়েছিল, কুকুরের ডাক শুনে তারা জাগলো। আমায় দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় বনের মধ্যে যেতে দেখেছিল দুপুরের পরে—বললে, "খুব বেঁচে গিয়েছিস বাবু। শঙ্খচূড় সাপের সামনে পড়লে আর বাঁচতিস না। ধন্‌ঝরির বনে বড্ড শঙ্খচূড় সাপের ভয়।"

রাতটা সে গ্রামে কাটিয়ে সকালের দিকে সুবর্ণরেখা পার হয়ে গালুডিতে ফিরে এলাম।

গঙ্গাধরের বিপদ

অনেকদিন আগেকার কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে। সে সময় মসলাপোস্তায় গঙ্গাধর কুণ্ডুর ছোটখাটো একখানা মসলার দোকান।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলি জেলা, চাঁপাডাঙ্গার কাছে। অনেকদিনের দোকান, যে সময়ের কথা বলচি গঙ্গাধরের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভালো যাচ্ছিল না। নানারকম অসুখে ভুগতো প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। দোকান-ঘরের ভাড়া দু-মাসের বাকি, মহাজনদের দেনা ঘাড়ে—দুপুর বেলা দোকানে বসে থেলো হুঁকো হাতে নিয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধ্যের সময় গোমস্তা ভাড়া নিতে আসবে বলে শাসিয়ে গিয়েচে। কি বলা যায় তাকে!

এক পুরোনো পরিচিত মহাজনের কথা তার মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারী মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েচে, শোধও করেচে, কিন্তু সুদের হার বড় বেশি বলে ইদানিং বছর কয়েক গঙ্গাধর সেদিকে যায় নি।

ভেবেচিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হল। সুদ বেশি বলে আর উপায় কি? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধ্যের মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে দেরি হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হনহন করে হেঁটে আসচে—এমন সময়ে একজন লোক তাকে ডেকে বললে, "এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জরা..."

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলে সেখানে কতকগুলো

গাছপালার বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জন, তার ওপর আবার তার সঙ্গে রয়েচে টাকা। গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হল এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এল। ওই গাছগুলোর তলায়—সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের ওপর পড়েচে, মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। পরনে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে সুর নিচু করে হিন্দীতে ও ভাঙা বাংলায় মিলিয়ে বললে, "বাবু, সস্তায় মাল কিনবেন?"

গঙ্গাধর আশ্চর্য হয়ে বললে, "কি মাল?"

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বললে, "এখানে কথা হবে না বাবু, পুলিশ ঘুরচে, আমার সঙ্গে আসুন···"

ঝুপ্‌সি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বললে, "জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট মাল—লুকিয়ে দেবো!"

গঙ্গাধর চমকে উঠলো।

সে কখনও ও ব্যবসা করে নি। ডিউটি-ছুট কোকেন—কি সর্বনেশে জিনিস! ভালো লোকের পাল্লায় সে পড়েচে! না—সে কিনবে না।

লোকটা সম্ভবত পাঞ্জাবী মুসলমান। বাংলা বলতে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। অনুনয়ের সুরে বললে, "বাবু আপনি নিন। আপনার ভালো হবে। সিকি কড়িতে দেবো···আমার মুশকিল হয়েচে আমি মাল বিক্রির লোক খুঁজে পাচ্ছিনে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় তো যেতে পারিনে, পুলিশের ভয় তো আছে? কেউ কথা কইচে না আমার সঙ্গে; সেই হয়েচে আরও মুশকিল। হঠাৎ শহরে এত পুলিশের ভয় হল যে কেন বাবু তা বুঝিনে। আগে যারা এ-ব্যবসা করতো, তাদের কাছে যাচ্ছি, তারা আমার দিকে চেয়েও দেখচে না। ···আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন পরে দামদস্তুর হবে···"

লোকটার গলার সুরে একটা কি শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজলো। কোকেনের ব্যবসাতে মানুষ রাতরাতি বড় লোক হয়েচে বটে। বিনা সাহসে, বিপদ এড়িয়ে চলে বেড়ালে কি লক্ষ্মীলাভ হয়? দেখাই যাক না।

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখলে যে লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়েছিল, কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে এই ভয়ে বেশি জোরে ডাকতেও পারলে না। চাপা গলায় বাঙালী-হিন্দীতে ডাকলে, " কোথায় গিয়া, ও খাঁ সাহেব?"

এদিকে ওদিকে চাওয়ার পর সামনে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁসাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বললে, "জলদি চলো, অনেক দূর যানে হোগা।"

কি একটা যেন ঢাকবার জন্যে লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করচে। "আমার সঙ্গে এসো, মাল দেখাবো।"

দুজনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেক দূর গেল। যে সময়ের কথা বলচি, তখন ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড় বড় ভড় ও নৌকো কাদার ওপর পড়ে আছে, দু-একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদাকাঁটার বন, পেছনে অনেক দূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে খাঁসাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বললে, "আমায় দেখতে পাচ্ছ তো?···"

"কেন পাবো না? এমন বয়েস এখনও হয়নি যে এই সন্ধ্যে-বেলাতেই চোখে ঠাওর

হবে না।"

একবার গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলে, "তোমার ডেরা কোথায়, খাঁসাহেব?"

লোকটা চকিতে পেছনে ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কেন, সে তোমার কি দরকার? পুলিশে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাকো যদি, তবে ভালো হবে না জেনো। মাল দেবো, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে,—আমার বাসার খোঁজে তোমার কি কাজ?"

লোকটার চোখের চাউনি অদ্ভুত! গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করলো; খুব ভালো দেখা যায় না, কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝলসে উঠলো। না, তার সঙ্গে টাকা রয়েচে—এ-অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধ্যেবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েচে? লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন এসেইচে, তখন আর চারা নেই। বিশেষত, সে যে ভয় পেয়েচে এটা না-দেখানোই ভালো। দেখালে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না! ছুরি বার করে বসলে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেকদূর গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, গুদামঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখলে গুদামঘরের আশেপাশে সর্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হলেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়; সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হল গুদামঘরটা পুরোনো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। বাঁশের বেড়া খসে পড়েচে জায়গায় জায়গায়, চালের খোলা উড়ে গিয়েচে মাঝে মাঝে, সামনের দোরটা উই-ধরা, ভেঙে পড়তে চাইচে যেন।···

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হল। কেন সে এখানে এল এই সন্ধ্যায়? এরকম জায়গায় একা মানুষে আসে, বিশেষ করে এতগুলো টাকা সঙ্গে করে? সে আসতো না কখনই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙাল দেশ থেকে নতুন আসে নি। ওই লোকটির কথার সুরে কি জাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেচে, সাধ্য ছিল না যে সে ছাড়ায়! একথা এখন তার মনে হল।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁসাহেবের মূর্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরনের, যেন মনে হয় অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল, আবার ফুটে বেরুলো। কোথাও যে চলে গিয়েছিল এমন মনে হয় না। পাকা আর ঝুনো খেলোয়াড় আর কি!

খাঁ সাহেব দোর খুলে গুদামঘরে ঢুকলে। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে আসতে বললে তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিমঝিম করচে, বুক ঢিপঢিপ করচে। এই অন্ধকার গুদাম ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে কিংবা ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেচে। লোকটা নিশ্চয়ই জানতো যে তার কাছে টাকা আছে, অনুসন্ধান রেখেছিল। কে জানে খোদাদাদ খাঁয়ের দলের লোক কিনা? গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। একবার সে ভাবলে, দৌড়ে পালাবে? কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, এই জোয়ান পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

কলের পুতুলের মতো গঙ্গাধর গুদামঘরের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য! গুদামের ওদিকের

দেওয়ালটা যে একেবারে ভাঙা! গুদামের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে। এক জায়গায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে, কিন্তু নাকে মুখে লাগে। একটা কি রকম ভ্যাপ্‌সা গন্ধ গুদামের মধ্যে, মেজেটা স্যাঁতসেতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকে নি।

এদিকে আবার খাঁসাহেব কোথায় গেল? লোকটা থাকে থাকে যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ···মিনিট দুই হবে, কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা···আবার সেই ভয়টা হল। কেমন এক ধরনের ভয়···যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এই বা কি রকম ভয়? আর গুদামঘরটার মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইচে মাঝে মাঝে।

মিনিট-দুই পরেই খাঁসাহেব—এই তো আধ অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে।···

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বললে খাঁসাহেব। বললে, "তুমি কালা নাকি? এতক্ষণ কথা বলচি, শুনতে পাচ্ছ না? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোকেন যে জায়গায় আছে বললাম, তা দেখতে পেয়েচ? শাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বললাম পিপে দুটো। হাঁ করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে কেন?"

বা রে! এত কথা কখন বলেচে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেবল ভ্যাবাচাকা হয়ে গিয়েছে, মূঢ়ের মতো দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা—কই কোথায় শাবল?"···

কথা বলতে বলতে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁসাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল তার বিভ্রান্ত, বিমূঢ়, আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনে খাঁসাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত-পা, সারা দেহটা যেন চুরচুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়চে···সব যেন ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে···খাঁসাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে চেষ্টা করচে! কিন্তু পেরে উঠচে না···সব ভেঙে গেল গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল···এক···দুই···তিন···চার···

আর কোথায় খাঁসাহেব? চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিশিয়ে গিয়েচে ···একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপটা এল কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্তরবে চীৎকার করে গুদামঘরের স্যাঁতসেতে মেঝের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

একটা দেশী ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পৌঁছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কানাকড়িও খোয়া যায় নি। তবে শরীর শুধরে উঠতে সময় নিয়েছিল, অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারতো না।

মাস দুই পরে মেটেবুরুজে খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে গঙ্গাধর টাকা নিয়ে যাবার দিন কি ঘটনা ঘটেছিল সেটা বললে। খোদাদাদ খাঁ গল্প শুনে গম্ভীর হয়ে গেল!

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "সাহ্‌জী, ও হল আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর পনেরো আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল, সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে, জাহাজের লোকের সঙ্গে সড় ছিল। কোথায় সে মাল রাখতো কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে খুন হয়। কে বা কেন খুন করলে জানা যায় নি, কেউ ধরা পড়ে নি। তবে দলের লোকই তাকে খুন করেছিল এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয় আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রি করবার

জন্যে, ওর পুরোনো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা।...তা বাবু, সে গুদাম ঘরটা কোথায় তুমি দেখাতে পারবে?"

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেত না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়লো, পুরোনো ভাঙা গুদামঘরটায় অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা। হতভাগ্য এতদিনেও কি বোঝে নি সে মারা গিয়েচে?...কে উত্তর দেবে? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন।

রাজপুত্র

কাঞ্চীর রাজপুত্র এবার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। রাজ্যময় ধুমধাম পড়ে গেছে। কাঞ্চীর উত্তর প্রান্তে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুমন্দির। পুরোহিত গেছেন সেখানকার আশীর্বাদ নির্মাল্য আনতে, লোক পাঠান হয়েচে প্রয়াগতীর্থ থেকে জল আনবার জন্যে। সেই জলে স্নান করিয়ে বিষ্ণুর পূজা-নির্মাল্য তাঁর কপালে ঠেকিয়ে রাজপুত্রকে পুরনারীরা বরণ করবেন।

রাজা বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করেচেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। কোশলরাজের দূত কি এক প্রস্তাব নিয়ে এসেচে, রাজা তাই আজ সারাদিন ধরে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন—শরীর ও মন দুই-ই বড় ক্লান্ত। এমন সময়ে রাজকুমার কক্ষে ঢুকে পিতাকে প্রণাম করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা বললেন, "চন্দ্রসেন, তোমার কিছু বলবার আছে?"

রাজপুত্র বিনীত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, "বাবা, গত বছর যখন গুরুগৃহ থেকে ফিরে আসি তখন আপনি বলেছিলেন আমায় কিছুদিন দেশভ্রমণে যাবার অনুমতি দেবেন। আপনার অসুখের জন্যে এতদিন কোন কথা বলি নি। আমি এইবার সে বিষয়ে অনুমতি চাই।"

মহারাজ বিস্মিতসুরে বললেন, "কি বিষয়ে অনুমতি চাই বলো?"

"আমি দেশভ্রমণে যেতে চাই বাবা।"

"তুমি জানো তোমার যৌবরাজ্যের অভিষেকের সব আয়োজন করা হয়েচে?"

"সেই জন্যেই তো আরও বেশি করে যেতে চাই, বাবা। আমি কাঞ্চী ছাড়া জীবনে কখনও কিছু দেখলুম না, কিছু জানলুম না,—কানে শুনেচি উত্তরে হিমবান পর্বত আছে, দক্ষিণে সমুদ্র আছে, পশ্চিমে সিন্ধুনদ আছে—কাঞ্চী ছাড়াও আরও কত রাজ্যদেশ আছে, কিন্তু উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে আমি চোখ থেকেও অন্ধ। যার জীবনে কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাকে দিয়ে দেশ-শাসন কি করে হবে! আমায় যেতে দিন বাবা!"

এর দুদিন পরে রাজ্যের লোক সবিস্ময়ে শুনলে রাজকুমার চন্দ্রসেনের অভিষেক-উৎসব সম্প্রতি স্থগিত থাকলো—কারণ তিনি চলেচেন বিদেশ ভ্রমণে—একা, সঙ্গে তিনি কাউকে নিতে রাজী নন।

সত্যই রাজকুমার কউকে সঙ্গে নেন নি।

আজ সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চন্দ্রসেন তাঁর প্রিয়-সাদা ঘোড়াটিতে চড়ে একা পথ চলেচেন। আর সঙ্গে থাকবার মধ্যে বাঁদিকে খাপে-ঝোলানো পিতৃ-দত্ত তলোয়ারখানি। আর আছে চোখে অসীম তৃষ্ণা, বুকে অদম্য সাহস ও নির্ভীকতা। কাঞ্চী রাজ্যের সীমা ছাড়িয়েও দুদিনের পথ চলে এসেচেন, কত গ্রাম, মাঠ, বন, নদী পার হয়ে চলেচেন—সবই অচেনা, এ

তাঁর নিজের রাজ্য কাঞ্চী নয়, এখানে তিনি একজন অজানা পথিক মাত্র।

তখনও সূর্য অস্ত যায় নি। এক নদীর ধারে তার ঘোড়া এসে পৌঁছুলো তাঁকে নিয়ে। প্রকাণ্ড নদী—বৈকালের রাঙা আলোয় ওপারের বনরেখা অপূর্ব দেখাচ্ছে। অতবড় নদী কি করে পার হবেন, রাজকুমার চিন্তায় পড়লেন। কোনদিকে মানুষের বাসের চিহ্ন নেই—সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে ধূসর হয়ে এল। বিজন নদী—তীরের ছন্নছাড়া চেহারাটা সুমুখ আঁধার রাতে গাঢ় ছায়ায় যেন আরও বেশি ছন্নছাড়া হয়ে ফুটে উঠলো।

ওপারে বহু দূরে একটা পাহাড়—নীল চূড়া একটু একটু চোখে পড়ে। রাজকুমার চেয়ে থাকতে থাকতে পাহাড়ের ওপর থেকে আগুনের রাঙা একটা হল্‌কা হঠাৎ আকাশের পানে লক্ লক্ করে জ্বলে উঠেই দপ্ করে নিবে গেল। রাজপুত্র অবাক হয়ে সেদিকে চেয়েই আছেন এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড বাজপক্ষী সন্ধ্যার আকাশে ডানা মেলে নদীর উজান দিক থেকে উড়ে এসে তাঁর মাথার ওপর তিন চার বার চক্রাকারে ঘুরে আবার কোন্‌দিকে অদৃশ্য হোল।

রাজকুমারের নির্ভীক মনও একটুখানি কেঁপে উঠলো। তিনি জানতেন, তাঁদের বংশে কারুর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মাথার ওপর গৃধ্রজাতীয় পাখি তিনবার ওড়ে—কেউ কেউ বলেচেন, বিশেষ করে শাকুন-শাস্ত্রবিৎ কোন গণৎকার সেবার বলেছিলেন যে এই গৃধ্র তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের হাতে অন্যায়ভাবে অবিচারে নিহত কোনো শত্রুর আত্মা—বহুকাল ধরে সে পৈশাচিক উল্লাসের সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যায় নিজ শত্রুর বংশধরের মৃত্যুর পূর্বাভাস। কোথা থেকে আসে, কোথায় আবার উড়ে চলে যায়—কেউ বলতে পারে না।

রাতের সঙ্গে সঙ্গে এল হাড়কাঁপুনি ধারালো শীত। একটা বড় গাছও কোথাও নেই যার তলায় আশ্রয় নিতে পারেন। অবশেষে একটা মাটির ঢিপির পেছনে ঘোড়া থেকে নেমে রাজপুত্র নিজের আসন বিছালেন—সেখানটাতে হাওয়া বেশি লাগে না—শুকনো লতাকাঠি কুড়িয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে সে রাত্রের মতো তিনি সেখানেই রইলেন। উপায় কি?

গভীর রাত্রে রাজপুত্রের ঘুম ভেঙে গেল! বহুদূরে যেন কাদের আর্তনাদ—মৃত্যু-পথের পথিকদের অন্তিম চিৎকারের মতো করুণ। রাজপুত্র নিজের অলক্ষিতে একবার শিউরে উঠলেন। শয্যার পাশের আগুন নিবে গিয়েচে, উঠে আগুন ভালো করে জ্বাললেন। সারারাত্রির মধ্যে ঘুম আর এল না কিন্তু।

ভোরের দিকে একটা ডিঙি পাওয়া গেল। তাতে পার হয়ে রাজকুমার ওপারে গিয়ে উঠলেন। ডিঙির মাঝি আধ-পাগল এবং বোধ হয় কানে আদৌ শুনতে পায় না। রাজকুমারের প্রশ্নের কোন উত্তর সে দিতে পারলো না!

প্রথমে একটা মরুভূমির মতো মাঠ—ঘাস, খড়, গাছপালা কিছুই নেই—কটা রঙের বালির পাহাড় এখানে-ওখানে। অনেক দূরে গিয়ে একটা জনপদ। কিন্তু কেমন একটা নিরানন্দ ভাব চারদিকে। পথ দিয়ে পথিক চলে না, দোকান-পসারে খদ্দের নেই, নদীর ঘাটে স্নানার্থীর দল নেই, মাঠে চাষারা চাষ করে না—যেন কেমন একটা বিষাদ ও অমঙ্গলের ছায়া চারিদিকে।

রাজকুমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়েছিলেন। নিকটেই একটি গৃহস্থের বাড়ি। সেখানে গিয়ে আশ্রয় চাইতেই তারা খুব যত্নের সঙ্গে আশ্রয় দিলে। অনেকদিন পরে রাজকুমার ভালো খাবার খেলেন, ভালো বিছানায় বিশ্রাম করতে পেলেন, মানুষের সঙ্গ অনেকদিন পরে বড় প্রিয় মনে হল। কয়েকদিন সেখানে রয়ে গেলেন তিনি। গৃহস্থের একটি

ছোট মেয়ে ও ছোট ছেলের সঙ্গে রাজকুমারের বড় ভাব হল। তারা তাঁকে ফুল তুলে মালা গেঁথে দেয়, দুপুরে তাঁর কাছে বসে গল্প শোনে, তাদের শত আবদার প্রতিদিন তাঁকে সহ্য করতে হয়। ছোট ছেলেটির উপদ্রবের তো আর অন্ত নেই।

অল্পদিনের মধ্যে রাজকুমার সে বাড়ির সবারই তো বটেই, গ্রামেরও সকল লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন। এত সুন্দর মুখশ্রী, এমন সুন্দর কান্তি, এমন মিষ্টি স্বভাবের মানুষ তারা কখনও দেখে নি। রাজকুমারের আসল পরিচয় কেউ জানে না। তিনি কাউকে সে সব কথা বলেন নি—সবাই ভাবে তিনি একজন গৃহহীন পথিক—হয়তো তাঁর কেউ কোথাও নেই। এতে সবারই স্নেহ তাঁর ওপর আরও বেড়ে যায়, কিসে তিনি সুখে থাকবেন কিসে আত্মীয়হীন নিঃসঙ্গ প্রবাস-কষ্ট তাঁর কমবে—সবারই এ চেষ্টা।

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, এমন সুন্দর চেহারার ছেলে নিশ্চয়ই কোন বড় ঘরের হবে। গ্রামের যিনি মণ্ডল, তাঁর এক মেয়ে পরমাসুন্দরী—সবাই বলে ওই ছেলেই এ মেয়ের উপযুক্ত হবে। বিধাতা ওর জন্যেই যেন এ দেবতার মতো সৌম্যকান্তি ছেলেটিকে কোথা থেকে জুটিয়ে এনেচেন। মণ্ডলগৃহিণীও রাজকুমারকে একদিন দূর থেকে দেখে এত পছন্দ করলেন যে তিনি স্বামীকে জানিয়ে দিলেন যদি ঐ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয় ভালোই—নইলে মেয়ে চিরকুমারী থাকুক, তাঁর আপত্তি নেই।

রাজকুমার কিন্তু কিছুতেই তেমন আমোদ পান না। তাঁর মনে কি একটা বিপদের ছায়া সকল আনন্দকে ম্লান করে রাখে। একবার ভাবেন হয়তো বাপ-মাকে অনেকদিন দেখেন নি বলে এমন হয়—কিন্তু তাঁর মন বলে তা নয়, তা নয়,—ওসব সামান্য সুখ-দুঃখের ব্যাপার এ নয়—এ এমন একটা কিছু, যার কারণ আরও গভীর, জীবন-মরণ নিয়ে এর কারবার।

ক্রমে এল সে মাসের কৃষ্ণপক্ষ। রাজকুমার অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন বাড়িতে সবারই চোখে জল—গ্রামসুদ্ধ লোক সকলে বিষণ্ণ, নিরানন্দ। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলে না, কারণ, জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাওয়া যায় না! সবাই কিসের ভয়ে জুজু হয়ে আছে যেন।

অবশেষে রাজকুমার কথাটা শুনলেন। এখান থেকে এক যোজন দূরে গৃধ্রকূট পাহাড়ের ওপর রাজগুরু এক কাপালিকের সাধন-পীঠ। প্রতি অমাবস্যায় সেখানে নরবলির জন্য প্রতি গ্রাম থেকে পালাক্রমে একটি তরুণ বয়স্ক লোক পাঠানো চাই-ই। রাজার হুকুম। এবার এ গ্রামের পালা।

শোনা মাত্র রাজকুমার কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তাঁর পিতৃদত্ত তূণের তীক্ষ্ণ ইস্পাতের ফলা-পরানো যে বাণ, তা কি শুধু নিরীহ পশুপক্ষী শিকারের জন্যে?

"ক্ষতি হতে ত্রাণ করে এই সে কারণ—মহান ক্ষত্রিয় নাম বিদিত জগতে।"—অস্ত্রগুরুর সে উপদেশ রাজকুমার কি ভুলে গিয়েচেন এত শীগ্‌গির!

অমাবস্যার দিন মণ্ডলের বাড়িতে পাশার সাহায্যে নির্ধারিত হবে এবার কে গ্রাম থেকে যাবে। রাজকুমার এ-কথা শুনলেন। অমাবস্যার পূর্বদিন গভীর রাত্রের অন্ধকারে তিনি চুপি চুপি শয্যাত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন—কেউ জানে না। সকালে উঠে তাঁকে আর কেউ দেখতে পেলে না।

মণ্ডলের বাড়িতে পাশার মজলিসে যার নাম উঠল সে গৃহস্থের একমাত্র পুত্র। সবাই চোখের জলে ভেসে তাকে বিদায় দিলে। তার বৃদ্ধ পিতা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চললো কাপালিকের কাছে—যদি হাতে পায়ে ধরে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে এই দুরাশায়।

গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে গিয়ে তারা যা দেখলে, তাতে তারা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। বড় জামগাছটার তলায় দুটো মৃতদেহ একটা তাদের গ্রামের সেই তরুণ অতিথির, আর একটা কাপালিকের—দেখে মনে হয় দুজনেই পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করেচে। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ সবাই ছুটে এল দেখতে। যে নিজের প্রাণ দিয়ে তাদের চিরকালের জন্যে বিপদমুক্ত করে গেল—রাজার ভয়ে গোপনে চোখের জলে ভেসে তার শেষ সৎকার সম্পন্ন করলে।

রাজকুমারের সত্যিকার পরিচয় সে দেশের লোক তখনও জানে নি।

চাউল

মানভূমের টাঁড় ও জঙ্গল জায়গা। একটু দূরে বড় পাহাড়শ্রেণী, অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বসন্তকালের শেষ, পলাশ ফুল বনে আগুন লাগিয়ে দিয়েচে, নাকটিটাঁড়েয় উঁচু ডাঙা জমি থেকে যতদূর দেখা যায়, শুধু রক্তপলাশের বন দূরে নীল শৈলমালার কোল ছুঁয়েচে।

জঙ্গল দেখতে এসেচি এদিকে, কাছেই রাস্তার ধারে পলাশবনের প্রান্তে ডাকবাংলোতে থাকি, জঙ্গলের কাঠে কেমন আয় হবে তাই দেখে বেড়াই। একদিন সন্ধ্যের আগে নাকটিটাঁড়ের বন দেখে ফিরচি, পথের ধারে একটা হরিতকী গাছের তলায় একটি লোক ও একটি ছোট মেয়ে বসে পুঁটুলি খুলে কি খাচ্ছে। জনহীন পথিপার্শ্ব, কেউ কোনদিকে নেই—সন্ধ্যেরও আর অল্পই বিলম্ব, সামনে বাঘমুণ্ডীর বনময় পথ, এমন সময়ে লোকটা কি করে জানবার আগ্রহে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটার চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। মাথার চুল কিছু পাকা, কিছু কাঁচা। পুঁটুলির মধ্যে খানদুই ছেঁড়া নেকড়া, একখানা কাঁথা আর কিছু মকাই—সের দুই হবে, একটা খালি চায়ের কিংবা বিস্কুটের টিন। বোধ হয় সেটাই তৈজসপত্রের অভাব পূর্ণ করচে সব দিক দিয়ে। সঙ্গের মেয়েটির বয়েস চার কি পাঁচ। পরনে ছোট্ট একটু ময়লা নেকড়া মেয়েটার, কোমরে ঘুন্সি।

আমি বললাম, "কোথায় যাবে হে, বাড়ি কোথায়?"

লোকটি মানভূমি বাংলায় বললে, "তোড়াং হে···টুকু আগুন আছে?"

"দেশলাই? আছে, দিচ্ছি।···তোড়াং কতদূর এখান থেকে?"

টুকু দূর আছে বটে। পাঁচ কোশ হবেক।"

কোথা থেকে আসা হচ্ছে এমন সন্ধ্যেবেলা?"

"হেই সেই পুরুলিয়া থিকে। ···আগুন দাও বাবু। শোরিল এক্কেবারে কাবু হয়ে গিয়েছে। হেই মেয়েটার মা মরে গেল ওর দু'বছর বয়সে। ওকে রেখে জঙ্গলে কাঠের নাম করতে যাইতে পারি নাই—তাই পুরুলিয়া গেইছিলি। ভিক্ষা মাঙি দু'বছর রঁইয়েছিলি।"

লোকটির কথাবার্তার ধরন আমাকে আকৃষ্ট করলে। ডাক-বাংলোতে সন্ধ্যার সময়ে ফিরেই বা কি হবে এখন? সেখানেও সঙ্গিহীন ঘর-দোর। তার চেয়ে একটু গল্প করা যাক এর সঙ্গে। কাছে একটা বড় পাথর পড়েছিল, সেটার ওপর বসে ওকে একটা বিড়ি দিলাম। নিজেও একটা ধরালাম। লোকটার বাড়ি নাকি পাঁচ-ছ' ক্রোশ দূরবর্তী একটি ক্ষুদ্র বন্য গ্রামে, বাঘমুণ্ডী ও ঝালদা শৈলমালা ও অরণ্যের মধ্যবর্তী কোন নিভৃত ছায়াগহন উপত্যকাভূমিতে, পলাশ, মহুয়া, বট, কেঁদ গাছের তলায়। ওর আর দুটি সন্তান হয়ে মারা যাওয়ার পরে এই মেয়েটি হয়

এবং মেয়েটির বয়স যখন দু'বছর, তখন ওর মাও হল মৃত্যুপথযাত্রী। লোকটা জঙ্গলের কাঠ ভেঙে এনে চন্দনকিয়ারীর হাটে বিক্রি করতো এদেশের অনেক গ্রাম্যলোকের মতো। কিন্তু ঘরে কেউ নেই দু'ছরের মেয়েকে দেখবার, তাকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চ পাহাড়ে উঠে রৌদ্র ও বর্ষায় কি করে কাঠ ভাঙে? তাই ঘরে আগড় বন্ধ করে ও চলে গিয়েছিস অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় পুরুলিয়া শহরে।

আমি বললাম, "কাঠের কাজে আয় হত কেমন?"

লোকটা বিড়িতে টান দিয়ে বললে, "বোঝা পিছু তিন আনা, চার আনা। জঙ্গলে ছাড় লিত দু'পয়সা। চাল বস্তা ছিলি। হইয়ে যেতো পেটের ভাত দু'জনার। তারপর বাবু মেয়্যাটা হোলেক্, ওর মা মর‍্যা গেলেক্। তখন কচি মেয়্যাটারে ফেলে জঙ্গলে যেতে মন নাই সরলেক্। বলি যাই পুরুলিয়া, ভারি শহর, পেটের ভাত দু'জনার হইয়ে যাবেক।"

"পুরুলিয়া বড় জায়গা?"

"ওঃ বাবু, ইধার থিকে উধার যাওয়ার কূল-কিনারা দু'বছরে নাই পাইলেক্। ভারি শহর বাবু···" আমি ওকে আর একটা বিড়ি দিলাম। গল্প জমে উঠেচে। বললাম, "তারপর···?"

তারপর পুরুলিয়া শহরে কিভাবে গেল, তার গল্প করলে। ওদের পাশের গাঁয়ের একজন লোক পুরুলিয়া শহরে কি একটা কাজ করে, তার ঠিকানা খুঁজে বার করতে দিন কেটে গেল। সন্ধ্যা হয়েছে, তখন এক বড়লোকের বাড়ির ফটকে মেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করতে দাঁড়ালো। তারা দুটি পয়সা দিলে, দু'পয়সার ছোলা কিনে বাপ-মেয়েতে রাত কাটিয়ে দিলে গাছতলায় শুয়ে। পুলিশে আবার শুঁতে দেয় না; অর্ধেক রাত্রে এসে লণ্ঠনের আলো ফেলে বলে, "হিঁয়াসে হঠ্ যাও!" তার পরদিন আলাপী লোকের সন্ধান মিললো। গিয়ে দেখে দেশে সে লোকটা যত বড়াই করে, আসলে সে তত বড় নয়। সামান্য একটা দু-কামরা ঘরে সে আর তার স্ত্রী থাকে—তামাক মেখে বিক্রি করে মাথায় নিয়ে, কখনও জলের কুঁজো পাইকেরি দরে কিনে ফিরি করে খুচরো বেচে—এই সব উঞ্ছবৃত্তি। অথচ দেশে বলেছিল সে বড় সাহেবের আরদালি।

যাহোক, অনেক বলা-কওয়াতে সে জায়গা একটু দিলে—ঘরের বাইরের দাওয়ার একপাশে শুয়ে থাকতে হবে, তবে নিজের এনে খাওয়া-দাওয়া, তার ভার সে নেবে না। বছর দুই সেখানেই থেকে চলেছিল যা হয় একরকম—তারপর এই অকাল পড়লো, চালের দাম চড়লো—শহরে চালের দাম হল আঠারো টাকা। ভিক্ষে আর তেমন লোক দিতে চায় না—তাও হয়তো চলতো যা হয় করে, কিন্তু যাদের বাড়িতে থাকা তারা গোলমাল করতে লাগলো। তারা আর জায়গা দিতে চায় না, বলে, "আমাদের লোক আসবে, বাড়ি ছেড়ে দাও।" রোজ গোলমাল করে, তাই আজ তিন দিন শহর থেকে বেরিয়ে জন্মভূমি তোড়াং গ্রামে চলেচে।

ছোট মেয়েটা এতক্ষণ খালি বিস্কুটের টিন হাতে করে বাজাচ্ছিল।

ওর দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে চেয়ে লোকটা বললে, "এর নাম রেঁখেছে থুপী।"

আমি বাপের মনে আনন্দ দেবার জন্যে বললাম, "থুপী? বেশ নাম।"

বাপ সগর্বে বললে, "হাঁ, থুপী?" তারপর আমায় বললে, "বাবু, তামাক কিনবার পয়স দিবেন দুটি?"

আমি পয়সা সামান্যই নিয়ে বেড়াতে বার হয়েচি, জঙ্গলের পথে পয়সা কি করবো? ওকে দুটি মাত্র পয়সা দিতে পারলাম। থুপী কি একটা বললে ওর বাবাকে, বাবা তাকে কাঁধে

নিয়ে চললো। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম—

রাস্তা যেখানে উঁচু হয়ে ওদিকের সব দৃশ্য ঢেকে দিয়েচে, সেখানে ওর পাঁচ বছরের মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে পুঁটলি বগলে ও চলেচে—সেদিকেই অস্তদিগন্ত ও সূর্যাস্ত, রঙীন আকাশের পটে ওর মূর্তি দেখাচ্ছে ছবির মতো, কারণ আগেই বলেছি রাস্তা উঁচু হওয়ার দরুন সেখানে আর কিছু দেখা যায় না, রাস্তাই সেখানে চক্রবালরেখার সৃষ্টি করেচে।

মনে মনে ভাবলাম, ওর কোথাও অন্ন নেই, গৃহ নেই—পাঁচ বছরের মেয়েকে কত স্নেহে কাঁধে তুলে ও যে চললো গ্রামের দিকে, সেখানে অন্ন কি জুটবে এ দুর্দিনে—যদি পুরুলিয়া শহরে না জুটে থাকে? কোন্ বৃথা আশার আকর্ষণ ওকে নিয়ে চলেচে গ্রামের মুখে? তার পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।···

এ হল গত মাসের কথা। তখনও চাল ছিল ষোল টাকা আঠারো টাকা মণ, ক্রমে তাই দাঁড়ালো বত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা। এই সময় একবার কার্য উপলক্ষে বিহার থেকে আমায় যেতে হল বাংলাদেশে, পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলায়। মানুষের এমন কষ্ট কখনও চোখে দেখি নি—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হবে।

যে আত্মীয়ের বাড়ি ছিলাম তাদের বাড়িতে সন্ধ্যা থেকে কত রাত পর্যন্ত শীর্ণ, বুভুক্ষু, কঙ্কালসার বালকবালিকা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় কালো হাঁড়ি উঁচু করে তুলে দেখিয়ে বলচে,—"একটু ফেন দিন মা, একটু ফেন!···" অনাহারে মৃত্যুর কত মর্মন্তুদ কাহিনী শুনে এলাম সারা পথ কুমিল্লা থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত—স্টীমারে, ট্রেনে।

বিহারে এসে দেখি এখানেও তাই। বহেরাগোড়া স্কুলের বোর্ডিঙে ড্রেন দিয়ে যে ভাতের ফেন গড়িয়ে পড়ে তাই ধরে খাবার জন্যে একপাল বুভুক্ষু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাঁড়ি হাতে দুবেলা বসে থাকে—তারই জন্যে কি কাড়াকাড়ি!

হেডমাস্টার বললেন, "এই গ্রামের ডোম আর কাহারদের ছেলেমেয়ে এখানেই পড়ে আছে ভাতের ফেনের জন্যে—সকাল থেকে এসে জোটে আর সারাদিন থাকে, রাত ন'টা পর্যন্ত। সামান্য দুটো ভাতের জন্যে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে।"

পুরুলিয়া থেকে আদ্রা যাচ্ছি, প্ল্যাটফর্মের খাবারের দোকানে খাবার খেয়ে পাতা ফেলে দিয়েচে লোকে—তাই চেটে চেটে খাচ্ছে উলঙ্গ, কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলেরা—অথচ সে পাতায় কিছুই নেই! কি চাটছে তারাই জানে!

এই অবস্থার মধ্যে ভাদ্রমাসের শেষে আমি এলাম এমন একটা জায়গায়, যেখানে অনেক লোক খাটচে একজন বড় কন্ট্রাক্টারের অধীনে ডিনামাইট্ দিয়ে পাথর ফাটানো কাজে। জঙ্গলের মধ্যে পাথর ফাটিয়ে এরা টাটায় চালান দিচ্ছে, স্থানীয় জমিদারের কাছে থেকে নতুন ইজারা নেওয়া পাথর খাদান।

একদিন সেখানকার ছোট্ট ডাক্তারখানাটার সামনে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। ডাক্তারখানাটার সংকীর্ণ বারান্দাতে একজন কুলি শুয়ে আছে। পিঠে ব্যান্ডেজ বাঁধা—ব্যান্ডেজ ভিজে রক্ত দরদরিয়ে পড়ে সিমেন্টের রোয়াক ভিজিয়ে দিয়েচে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েচে?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "এমন মাঝে মাঝে এক আধটা হচ্ছেই। ব্লাস্টিং করতে গিয়ে পাথর ছুটে লেগে মেরুদণ্ড একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েচে। সেলাই করে দিয়েচি, এখন টাটানগর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স আসচে।"

ভিড় একটু সরিয়ে কাছে গিয়ে দেখি একটা পাঁচ-ছ' বছরের মেয়ে ওর কাছে একটু দূরে

বসে—কিন্তু সে কাঁদেও না, কিছুই না—নির্বিকার ভাবে বসে একটা খড় তুলে মুখে দিয়ে চিবুচ্ছে।

আমি তাকে দেখেই চিনলাম—আটমাস পূর্বে মানভূমের বন্য অঞ্চলে দৃষ্ট সেই ক্ষুদ্র বালিকা থুপী!

আহত কুলির মুখ ভাল করে দেখে চিনলাম—এ সেই থুপীর বাবা, যে সগর্বে বলেছিল, "এর নাম রেখেচি থুপী।"

আশপাশের দু একজনকে জিগ্যেস করলাম, "এ কোথা থেকে এসেছিল জানো?"

একজন বললে, "মানভূম জিলা থেকে আজ্ঞে।"

"কি গাঁ?"

"তোড়াং।"

"ওর কোনো আপনার লোক এখানে নেই।"

"কে থাকবেক্ আজ্ঞে—ওর ওই বিটি ছানাটা আছে। কত কত ধুর থিক্যা এখেঁনে কাজ করতে এসেচে, চাল দেয় সেই জন্যে আজ্ঞে।"

"কোম্পানি কত করে চাল দেয়?"

"হপ্তায় পাঁচ সের মাথাপিছু।"

সুতরাং থুপীর বাপের ইতিহাস আমি অনেকটা অনুমান করে নিলাম। গ্রামে গিয়ে দেখলে বাড়ি ভেঙে চুরে গিয়েচে, চাল মেলে না, মিললেও ওর সামর্থ্যের বাইরের জিনিস তা কেনা। মকাই ও বিরি কলাই, তারপরে বুনো কচু ও ভুঁই-কুমড়োর মূল খেয়ে যতদিন চলবার চললো—কারণ ঠিক এই ইতিহাস আমি বিভিন্ন অঞ্চলগুলি থেকে আগত প্রত্যেক কুলির মুখেই শুনেচি—শেষে এখানে ও এসে পড়লো মজুরি, বিশেষ করে চাল পাওয়ার লোভে। পয়সা দিলেও গ্রামে আজকাল চাল মিলচে না, আমি সেদিন বহেরাগোড়া অঞ্চলে দেখে এসেচি।

অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এল। ধরাধরি করে থুপীর বাবাকে গাড়িতে ওঠানো হল—সে কেবলমাত্র একবার যন্ত্রণাসূচক 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া অত আদরের অত গর্বের বস্তু থুপীর নামও করলে না, তার দিকে ফিরেও চাইলে না।

ডাক্তার বললেন, "টাটা এখান থেকে সাতাশ মাইল রাস্তা। ঝাঁকুনিতেই বোধ হয় মারা যাবে—বিশেষ করে রক্তবন্ধ হল না যখন এখনও।"

দুধারে শালবনের মধ্যবর্তী রাঙা মরুম মাটির সোজা রাস্তা বেয়ে অ্যাম্বুলেন্সের মোটর ছুটলো থুপীর বাবাকে নিয়ে—পুনরায় অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে, পুনরায় পশ্চিমের আকাশ লক্ষ্য করে জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে। অত সাধের অনাথা থুপীকে কার কাছে রেখে চললো সে হিসেব নেবার অবসর তখন তার নেই।